

প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্তিকা

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
(পর্ষতের ৫.১২.৭৯ তারিখের টি. বি. ৬/এইচ/৭৯/১৩৫ নং বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্তিকা

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের নব-নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অবলম্বনে রচিত)

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রীডার ও অধ্যাপক
শ্রীভাস্কর চট্টোপাধ্যায় এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.
এবং
রঘুনাথপুর কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক
শ্রীসুকেশ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.
কর্তৃক প্রণীত

সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮২

ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এল-এল. বি.
ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

[redacted]

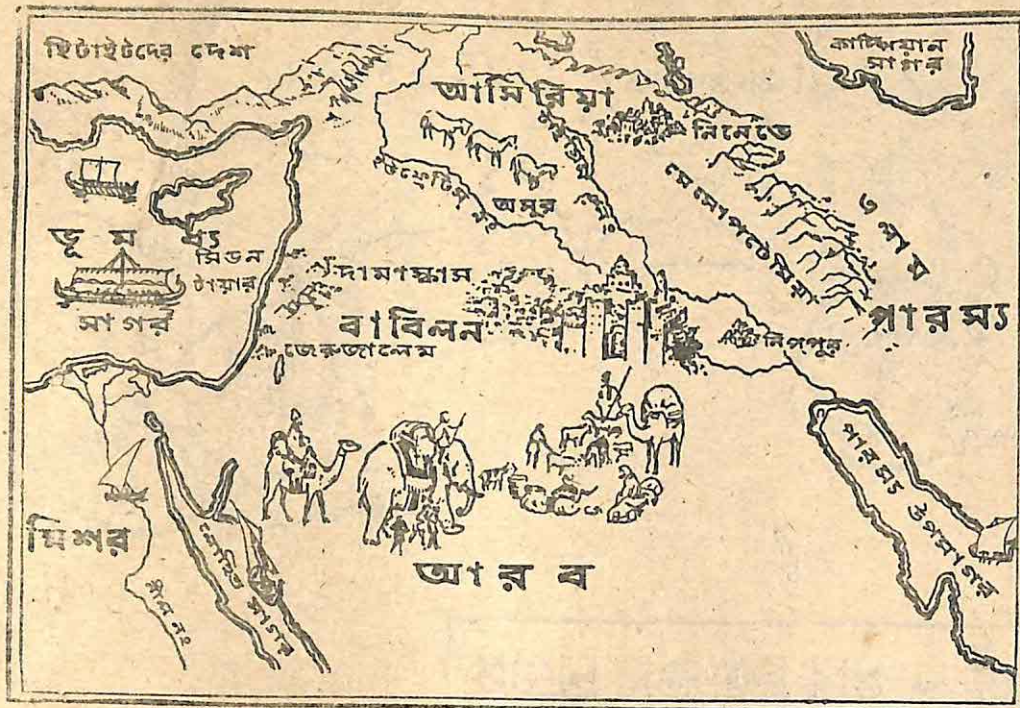
(ভারত সরকার হইতে স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কাগজে মুদ্রিত)

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল,
মহাবিদ্যা প্রেস,
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

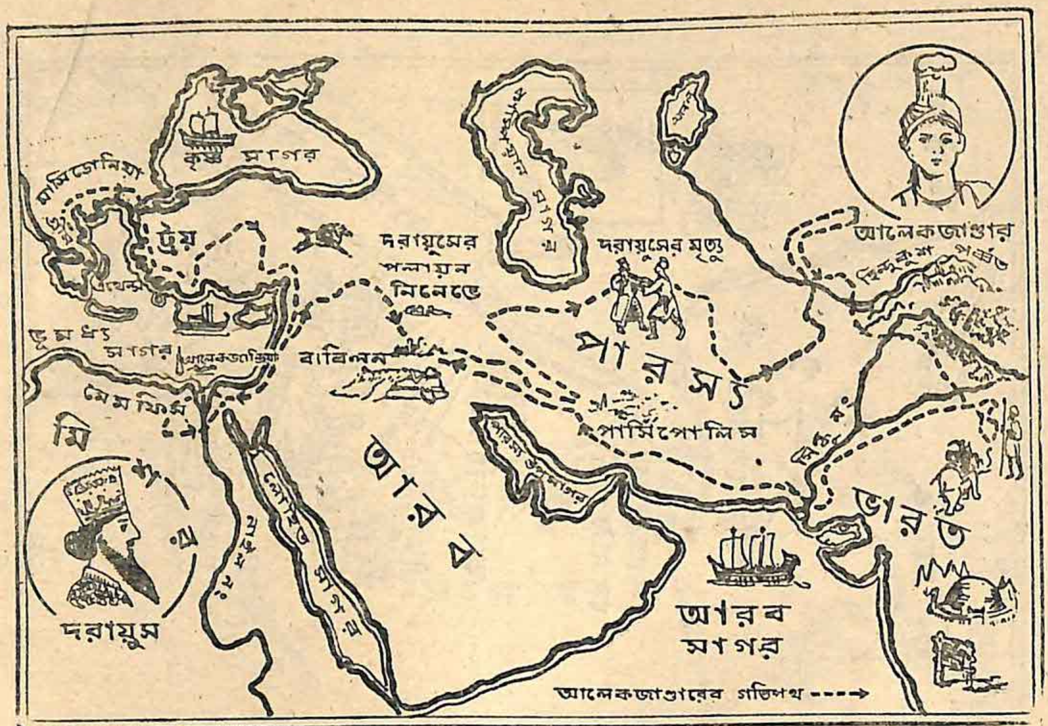
সূচীপত্র



[৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]



[৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]



[৬১-৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্তিকা

প্রথম অধ্যায়

১·১। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আমরা ইতিহাস পড়ব কেন? কারণ, ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারব, কেমন করে মানুষ ধীরে ধীরে বন্য-বর্বর অবস্থা থেকে বর্তমান সভ্য অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। একদিন মানুষ বাস করত বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়। সেদিন সে বন্য পশুর মতোই কাঁচা মাংস খেত আর উলঙ্গ হয়ে থাকত। না ছিল তার ঘরবাড়ী, না ছিল তার কাপড়-চোপড়।

এমনি অবস্থায় হাজার হাজার বছর কেটে গেল। তারপর মানুষ শিখল আগুনের ব্যবহার, ঘরবাড়ী তৈরি করল থাকবার জন্যে, খাবার যোগাড় করতে দূরে না গিয়ে ঘরের পাশের জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে ফসল ফলাতে লাগল। এমনিভাবে একটু একটু ক'রে মানুষ এগুতে লাগল সভ্যতার পথে। ঘরে ঘরে বাবা, মা আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তৈরি হ'ল এক-একটি 'পরিবার', আবার অনেকগুলি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠল 'সমাজ', আর সেই সমাজ যেখানে বসতি করল, তার নাম হ'ল 'গ্রাম'। গ্রামে যাতে সবাই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তার জন্যে দরকার হ'ল একজন মোড়লের। মোড়লের সহকারী সাঙ্গোপাঙ্গরাও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগল।

এদিকে সকলে মিলে ফসল ফলাতে গিয়ে মানুষ দেখল, যা' তাদের দরকার, তার অধিক ফলন হচ্ছে। তখন তারা নিজেদের ভেতর কাজ ভাগ করার কথা ভাবতে আরম্ভ করল। সমাজের কিছু লোক অবসর পেয়ে লেখা-পড়া, ধর্ম-কর্ম করতে লাগল, কেউ বা চিন্তা-ভাবনা ক'রে মাটির বদলে ইঁটের বাড়ি তৈরি করার

পদ্ধতি বের করল। কাপড়-চোপড়, গয়না-গাটি, আসবাব-পত্র, থালা-বাসন, অস্ত্র-শস্ত্র—কোনও কিছুরই অভাব থাকল না। চাষ-বাসের পাশাপাশি হাতের কাজ আর ব্যবসা বেশ জমে উঠল। ব্যবসার স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে গ্রাম থেকে শহর-নগরে পরিণত হ'ল।

ইতিহাস না পড়লে আমরা ভাবতাম, আমরা আজ যেমন আছি, তেমনি হয়ত চিরকালই ছিলাম। ইতিহাস পড়লে আমরা বুঝতে পারি, লক্ষ-লক্ষ বছরের চেষ্টায় মানুষ আজ সভ্যতার বর্তমান স্তরে পৌঁছেচে। ইতিহাস পড়লে মনে হবে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ নিশ্চয়ই আরও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।

১·২। প্রাচীন মানবজাতির পরিচয় লাভের উপায়

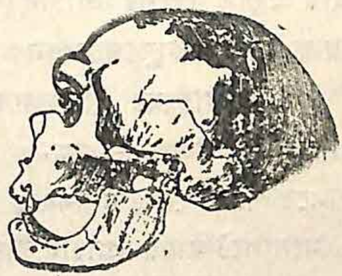
আমাদের বাড়ীতে তিন-চার পুরুষ আগে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের আমরা চোখে দেখিনি, কিন্তু মা-বাবার কাছে তাঁদের গল্প শুনেছি। তাছাড়া, প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু-না-কিছু পুরানো আমলের জিনিসপত্র থাকে, এগুলিই আমাদের সেকালের সংবাদ দেয়। আমাদের বাবার বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা কি ধরনের পোশাক পরতেন, কি রকমের থালা-বাটিতে খেতেন, এমন কি, কি-ভাবে তাঁরা আমোদ-আহ্লাদ করতেন —এই সব কথাই জানিয়ে দেয় ঐ পুরানো জিনিসগুলি।



পাথরের পাত্র [বহু প্রাচীন যুগের]

দশ-বিশ হাজার বছর আগে আমাদের যে সব পূর্বপুরুষ ছিলেন, তাঁদের কথাও আমরা জানতে পারি বহু পুরানো জিনিসপত্রের সাহায্যে। পুরানো জিনিস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের বলে প্রত্নতাত্ত্বিক ('প্রত্ন' মানে পুরানো)। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটির ওপর পুরানো ভাঙ্গা বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি খোঁজাখুঁজি করেন অথবা মাটির তলা খুঁড়ে পুরানো দিনের মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র খুঁজে বার করে থাকেন। এঁদেরই চেষ্টায় প্রাচীন মানবজাতির ইতিহাস জানা গেছে।

মাটির তলা থেকে অতি প্রাচীন মানুষের হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া গেছে—আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার নানা জায়গায়। এগুলি থেকে জানা যায়, প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে জাভায়, সাড়ে চার লক্ষ বছর আগে চীনে এবং সওয়া লক্ষ বছর আগে ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে মানুষ ছিল। কিন্তু তাদের কথা বেশী কিছু জানা যায় না।


মানুষের মাথার খুলি
[বহু প্রাচীন যুগের]

যে-সব মানুষের অস্ত্রশস্ত্র, পাথর ও মাটির সর্বদা ব্যবহারের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে, তারাও প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। ইউরোপের নানাস্থানে ঐ সব মানুষের পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাস সেই যুগ থেকেই আরম্ভ করতে হয়। কারণ, তাদের যে জীবনযাত্রার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল, তার আভাস পাওয়া যায় ঐ সব পুরানো জিনিসগুলি থেকেই।

আরও পরের যুগের মানুষের সভ্যতার কথা জানা যায় কতকগুলি মাটি-চাপা নগর খুঁড়ে—সে যুগের ভাঙ্গাচোরা কতকগুলি ঘরবাড়ী, স্নানাগার, কবর ও তার সঙ্গে অসংখ্য শিল্পকাজ—

মুদ্রা, পুতুল, সীলমোহর, টালির লিখন প্রভৃতি—আবিষ্কার ক'রে। এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা (বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু ও পাঞ্জাবে), মেসোপটেমিয়ার উত্তরে ব্যাবিলন, নিনেভে নগর, ক্রীট দ্বীপ, এশিয়া-মাইনরের ট্রয়, প্যালেস্টাইনের জেরিকো নগর প্রভৃতি স্থানে। এগুলি দেখে বেশ বোঝা যায়, পাঁচসাত হাজার বছর আগে পৃথিবীর কোন্ দেশে কি ধরনের সভ্য মানুষ বাস করত, কি ছিল তাদের সভ্যতার উপকরণ।

আর, মাটির ওপরের ব্যাপার আরও স্পষ্ট। প্রাচীন গুহা, পিরামিড, মন্দির, মূর্তি, শিলালিপি, স্তম্ভ, স্তূপ, মুদ্রা—এই সব থেকে পণ্ডিতেরা স্পেন, মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন মানব জাতির জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছেন।

প্রাচীন মানুষের ইতিহাস জানবার আর একটা উপায় প্রাচীন সাহিত্য ও লিখন,—যেমন, ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানতে পারি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় প্রাচীন বর্ণমালায় লেখা গ্রন্থ থেকে। পণ্ডিতেরা অনেক পরিশ্রমে এগুলির পাঠোদ্ধার করেছেন। আবার, গ্রীস ও রোমের পুরাণ-কথা ও কাহিনীগুলিও ইতিহাস রচনায় অনেক সাহায্য করে।

সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন সেকালের কয়েকজন ইতিহাস-লেখক ও পর্যটক। গ্রীসের হেরোডোটাস, চীনের কংফুশী এবং অনেক পর্যটক নানা দেশের বিবরণ লিখে গেছেন।

মোট কথা মাটির তলা থেকে ওপর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বহু উপাদান, এবং তার সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য লিপি, পট ও গ্রন্থ। এইগুলির সাহায্যে আমরা প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২·১। আদিম মানুষ

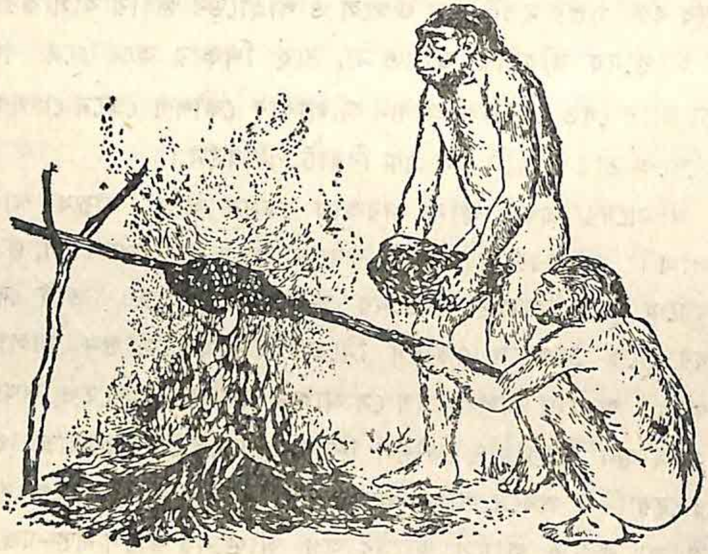
(ক) **আদিম মানুষের আগুনের ব্যবহার ঃ** আদিম কালে মানুষ বন্য পশুর মতই বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় বাস করত। সে আগুনের ব্যবহার জানত না, তাই শিকার করে এনে পশুর কাঁচা মাংস খেত। কিন্তু আগুন জ্বালাবার কৌশল জেনে ফেলবার পর থেকে তার জীবনে এল এক বিরাট পরিবর্তন।

আমাদের এখন জানা দরকার কেমন করে মানুষ আগুন জ্বালাল। পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে গিয়ে সে দেখলে যে, দু'খণ্ড পাথরকে ঠুকে দিলেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ বার হয়। তাই দেখে পাথর ঠুকে ঠুকে সে একদিন নিজের ইচ্ছামত আগুন জ্বালাতে শিখল। শুকনো ডালপাতায় সে আগুন জ্বালিয়ে রাখতেও শিখল। তবে, আগুন জ্বালাবার কৌশল শিখে প্রথমেই সে রান্নাবান্না শুরু করে দেয় নি। প্রথমে আগুন জ্বালিয়ে সে জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগল, কাঠের অস্ত্র আগুনের তাপে শক্ত-মজবুত করে নিতে শিখল, প্রবল শীতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল এবং তারপর কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে পুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করল।

আগুনের ব্যবহার শেখার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সভ্যতার সূত্রপাত হ'ল। পুরানো প্রস্তর যুগের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ইউরোপে ও এশিয়ার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব উপাদান থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত এবং উনুন তৈরি করে স্থায়ী ব্যবস্থা করেছিল আগুন জ্বালিয়ে রাখবার।

চীনের পিকিং শহরের কাছে চাউ কুতিয়েন নামক স্থানের গুহাগুলিতে জীবাশ্ম (ফসিল) এবং মানুষের হাতে তৈরি পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। জীবাশ্ম থেকে বোঝা যায়,এখানকার

প্রাচীন মানুষেরা ছিল এশিয়ার দক্ষিণের জাভা মানুষের স্বজাতি। এদের নাম দেওয়া হয় 'পিথেকানথ্রোপাস পিকিনেনসিস' বা 'পিকিং-এর প্রাচীন মানুষ'। পিকিং-মানুষেরা লম্বায় চার ফুট এগার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। এরা দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের



পিকিং মানুষ

মত হাঁটত আর দল বেঁধে শিকার করত। প্রায় চার লক্ষ বছর আগে এরা পৃথিবীতে বাস করত।

পিকিং-মানুষ প্রায় তিন লক্ষ বছরেরও আগে আগুনের ব্যবহার জানত। তাদের বাসস্থানের গুহাগুলিতে জন্তুজানোয়ারের আধপোড়া হাড় ও ছাইএর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। গাছের ডালের একটা দিক পুড়িয়ে-শক্ত-করা বর্শাও পাওয়া গিয়েছে। এই সব থেকে বোঝা যায় যে পিকিং-মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত। আগুনে এরা জীবজন্তুর মাংস ঝলসিয়ে খেত। এরা যে সব অস্ত্র ব্যবহার করত, সেগুলি পাথর কেটে কেটে তৈরি। কাজেই, ঐতিহাসিকদের মতে আগুনের আবিষ্কারের কৃতিত্ব পিকিং-মানুষেরই।

(খ) খাদ্য-সংগ্রহকারী মানুষ: সম্ভবতঃ আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচলক্ষ বছর আগে প্রাণিজগতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। বন্য জন্তুর মত আদিম মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদী থেকে। সেদিন মানুষ ছিল শিকারী। সে শিকার করত বনের পশু-পাখী, নদীর মাছ অথবা সংগ্রহ করত গাছের ফলমূল। এইগুলি ছিল তার জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপকরণ। পাথরের অস্ত্র অথবা কাঠের হাতিয়ার খাদ্যসংগ্রহের কাজে লাগত। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যে-যুগকে বলেন 'পুরাতন প্রস্তর যুগ' এবং ভূতাত্ত্বিকেরা যে-যুগকে বলেন 'প্লিস্টোসিন যুগ', সেই যুগে মানুষের জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল শিকার বা খাদ্যসংগ্রহ।

দৈত্যাকার ম্যামথ, বাইসন প্রভৃতি জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য-আমেরিকার মেক্সিকো উপত্যকায়। ঐ স্থানে খাদ্যসংগ্রহ-



বাইসন

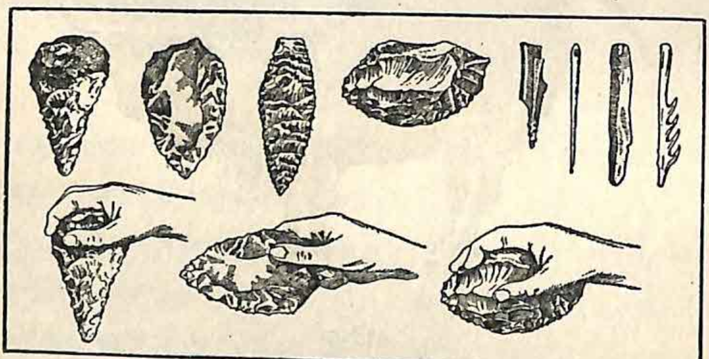
কারী আদিম মানুষের বসতি ছিল বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে একমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়া অন্য সব অঞ্চলে খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে এই সব আদিম পাথুরে হাতিয়ারের খোঁজ পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতে। তাই দক্ষিণ ভারতকেই বলা হয় আদিম খাদ্যসংগ্রহকারী মানব-সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান।

২·২। পুরানো প্রস্তর যুগ

পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা তাদের জীবনধারণের বিভিন্ন উপকরণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র পাথর দিয়ে তৈরি করত। পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের গঠন বিচার করে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পুরানো প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ।

পুরানো প্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ারগুলি ছিল ভোঁতা ও অমসৃণ। সে-যুগের মানুষ ধাতুর ব্যবহার বা কৃষিকাজ জানত না। তাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানও ছিল না। তারা ছিল শিকারী,—বন্য ঘোড়া বা মোষের পেছনে তাড়া করে তারা এক তৃণভূমি থেকে অন্য তৃণভূমিতে ছুটে বেড়াত। তাদের সময়েই ছিল অতিকায় হাতী। তারা শিকার করত বর্শা আর পাথর ছুঁড়ে।

এ যুগের শেষের দিকে মানুষ শুধু পাথর নয়, জন্তু-জানোয়ারের হাড় ও শিংকে হাতিয়ার তৈরির কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। পুরানো প্রস্তর যুগে মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার **আগুন**।



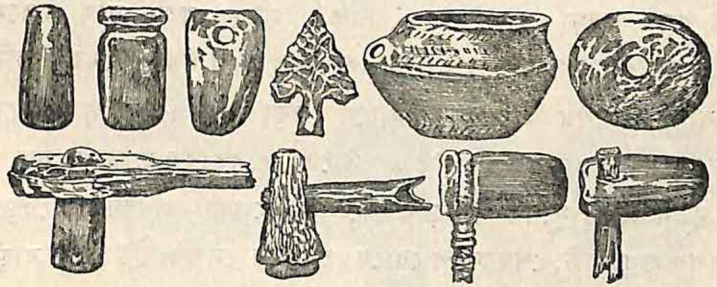
পুরানো প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

পুরানো প্রস্তর যুগের যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি হ'ল, হাত-কুড়ুল, বর্শা, উড়ন্ত বর্শা—এই সব। এছাড়া তাদের ব্যবহার্য ছিল হাড়ের তৈরি সূঁচ, ভেঁপু বা শিঙ্গা, গাছের বাকল থেকে তৈরি সূতা। গুহা বা মাটির গর্ত ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। তবে এ যুগের শেষের দিকে মানুষ কাঠের গুঁড়ি

সাজিয়ে বা গাছের ওপর মাচা বেঁধে কুটির তৈরি করত। খাদ্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হ'ত বলে তারা কোন স্থায়ী আস্তানা তৈরি করত না। তারা মৃতদেহ কবর দিত।

২·৩। নূতন প্রস্তর যুগ

এখন থেকে প্রায় দশ-বারো হাজার বছর আগে, অর্থাৎ প্রায় খৃস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দের মধ্যে মানুষের জীবনে প্রথম পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। একে 'বিপ্লব' বলা যেতে পারে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে পুরানো পাথরের যুগের মানুষ নূতন পাথরের যুগে পদার্পণ করে। কৃষি ও পশুপালন নূতন পাথরের যুগে বিপ্লবের সূচনা করে। এ যুগেও মানুষ তার জীবনধারণের উপকরণ তৈরি করত পাথর



নূতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদি

দিয়ে; তবে এই পাথরের উপকরণগুলি সে ঘষে-মেজে মসৃণ করত। এজন্য এ যুগকে বলা হয় 'নূতন প্রস্তর যুগ'। এ যুগের উপকরণ-গুলির মধ্যে পাওয়া যায়—পোড়ামাটির পাত্র, পাথরের লাঙ্গল ও কুড়ুল, পাথরের তীরের ফলা, ধনুক, কাস্তে ইত্যাদি। এই যুগের মানুষ আর খাদ্যসংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াত না। কৃষিকার্য জানার ফলে সে এখন থেকে হ'ল খাদ্য-উৎপাদক।

২·৪। নূতন প্রস্তর যুগের স্বরূপ

চাষ-বাসের আবিষ্কার করে মেয়েরা, পুরুষেরা নয়। প্রথম দিকে মেয়েরা ছোট ছোট জায়গায় বাগিচা-চাষ শুরু করে,—

গম ও যবের চাষই প্রথম শুরু হয়। পরে ক্ষেতে চাষ শুরু হয় পুরুষদের দ্বারা। গৃহপালিত পশু ছিল প্রধানতঃ ভেড়া, গরু, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি। তাছাড়া অন্যান্য শিংওলা পশু, শূকর, উট, মুরগীও পোষা হ'ত। গরু-প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে গোবর জমির সার-হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়।

মাটির পাত্র তৈরি এই যুগেই আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে কুমোরের চাকা আবিষ্কার হয় নি, তখন মানুষ হাতেই মাটির পাত্র গড়ত এবং রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে নিত। কুমোরের চাকা আবিষ্কার করার পরে তাদের মাটির তৈরি জিনিস আরও উন্নত মানের হয়।

পুরানো যুগের মানুষ হয় পাতার পোশাক, নয় হাড়ের স্চঁ দিয়ে পশুর চামড়া সেলাই করে পরত। নূতন প্রস্তর যুগে প্রথমে সূতার পোশাকের চল হয়; আরও পরে চালু হয় পশমের তৈরি পোশাক। পশম আবিষ্কারের আগে ভেড়া বা ছাগলের লোম দিয়ে এক ধরনের কাপড় বোনা হ'ত। তাঁতের ব্যবহারও তারা জানত।

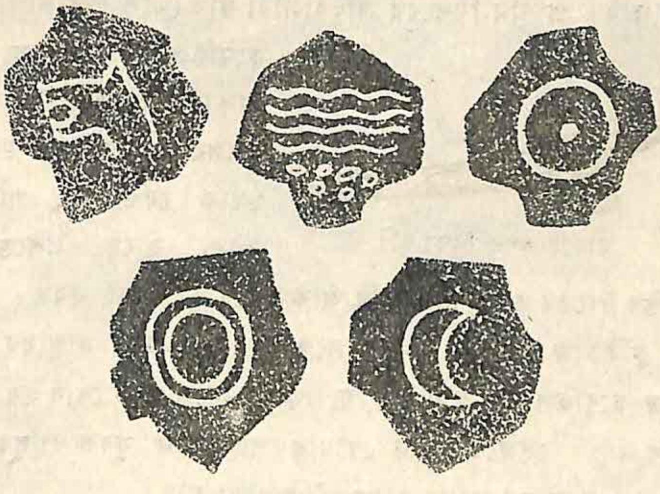
নূতন প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকে মাটিলেপা নলখাগড়ার বেড়া, তারপর শুধু মাটি, শেষকালে রোদে শুকিয়ে নেওয়া ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরি হয়। কোন কোন স্থানে এমন বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যার চারিদিকে ছিল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেওয়াল এবং দেওয়ালের বাইরে চওড়া গর্ত। মনে হয়, শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এই প্রাচীর এবং পরিখার ব্যবস্থা।

নূতন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে ধাতু আবিষ্কৃত হয়। পাথর ও ধাতু—উভয়ের ব্যবহারের মাঝামাঝি যুগে জোয়াল ও পাল আবিষ্কৃত হয়। জোয়াল দিয়ে ক্ষেতের চাষ শুরু হয়। পালের ব্যবহার শুরু হয় নৌকা করে জলপথে যাবার জন্যে। এছাড়া যাঁড় অথবা কুকুর বা গাধায় টানা স্লেজ-জাতীয় গাড়ীরও ব্যবহার হ'ত। চাকাওয়ালা গাড়ীর ব্যবহার শুরু হয় পরে—এক্ষেত্রে ঘোড়া ও গাধাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত।

চাষবাস ও পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রস্তর যুগের মানুষ স্থায়ী আস্তানা তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে এবং গ্রামের পত্তন করে। এর আগে নিতান্ত বাঁচার তাগিদে তারা মিলেমিশে চলত। অনুমান, নূতন প্রস্তর যুগে সমাজ গড়ে উঠেছিল। গোষ্ঠীজীবনে আইন-শৃঙ্খলা ছিল। কোনও গ্রাম অন্য গ্রামের ওপর নির্ভর করত না।

একসঙ্গে বসবাসের ফলে কতকগুলি রীতিনীতি, ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে। তখন মানুষ বিশ্বাস করত, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল, সব কিছুরই মধ্যে এক শক্তি আছে। সে মনে করত, এই শক্তি মানুষের ভালমন্দ দু'ই করতে পারে।

প্রথমে মানুষ কথা বলতে পারত না। সে গরিলা-শিম্পাঞ্জির মত শুধু চিৎকার করত। সে ধীরে ধীরে আলাদা আলাদা ধ্বনির সাহায্যে আলাদা অলোদা বস্তু বা কাজ বোঝাতে লাগল।

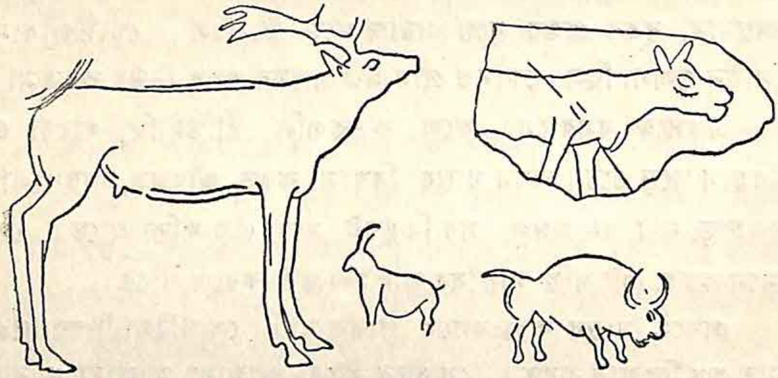


আদিম যুগের ছবির লিখন

[নেকড়ের মুখ এঁকে নেকড়ের ভয়; ঢেউ রেখায় নদী, গোল রেখায় সূর্য, তারা, চন্দ্র প্রভৃতি বোঝাত]

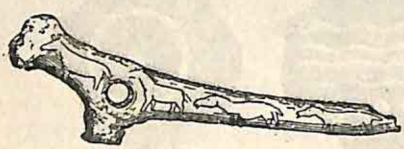
এইভাবে হ'ল ভাষার জন্ম। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ভাষার সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে থাকে।

মানুষের আঁকা ছবি তার ভাষারই সমবয়সী। দূরের লোককে কিছু বলার জন্যে মানুষ ছবি এঁকে রাখত। মানুষের প্রথম লিখন



প্রায় কুড়ি হাজার বছর পূর্বেকার গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত জীবজন্তুর ছবি

ছিল ছবি। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা ছবি থেকে চিত্রলিপি রচনা করেছিল। মনে হয়, ছবি আঁকাই ছিল প্রাচীন মানুষের অবসর কাটানোর উপায়। গুহার দেওয়ালে, পাথরের ওপর, হাড়ে, শিঙে এবং হাতির দাঁতের ওপর তারা ছবি আঁকত অথবা খোদাই করত।



হাড়ের ওপর আঁকা ছবি

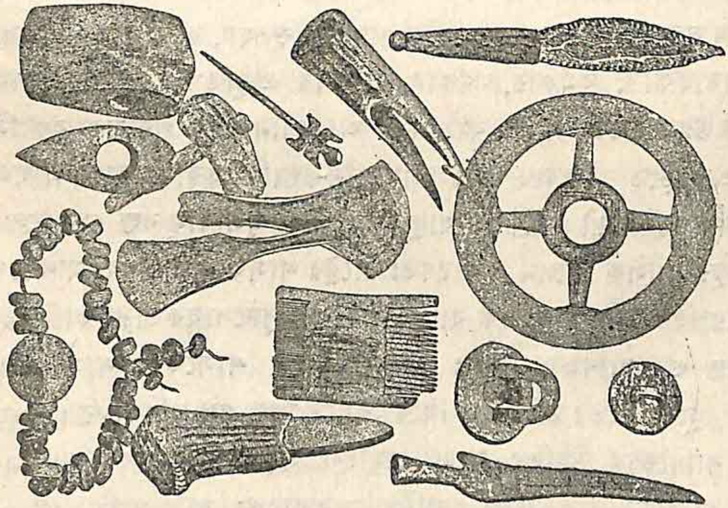
কৃষিকাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্বাস মানুষের মধ্যে কাজ করেছিল। তা হ'ল এই যে, রক্ত না দিলে মাটি বোধ হয় ফসল দেবে না। এইজন্যে বীজ বোনার পর কোন যুবক বা যুবতীকে হত্যা করে চাষের জমির পাশে পুঁতে রাখা হ'ত।

পরবর্তী কালের মানুষরা বিশ্বাস করত যে, জমিতে শস্য উৎপন্ন হয় দেবদেবীর দয়ায়। তাই তারা শস্য-উৎপাদন-কারী দেবতার পূজা করত। বিশেষ করে জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ানোর জন্যে মানুষ মাতৃদেবীর পূজা করত।

তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু-যুগ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ হ'য়েছে বিভিন্ন যুগ পার হ'তে হ'তে। প্রস্তর-যুগ থেকে ধাতু-যুগে পদার্পণ মানুষের ইতিহাসে অগ্রগতির নিদর্শন। যারা ধাতুর ব্যবহার প্রবর্তন ক'রেছিল, তাদের পূর্বপুরুষ নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষ। প্রস্তর-যুগ থেকে ধাতু-যুগে পদার্পণ করেছে মানুষ ক্রমশঃ। তারা পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি ধাতুর তৈরি অস্ত্রের ব্যবহার চলেছিল বহু বছর।



ধাতু-যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদি

তাছাড়া ধাতব অস্ত্রশস্ত্রের আকার নূতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্রের মতই প্রায় ছিল। তবে, সব দেশে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার একই রকম ছিল না। উত্তর ভারতে প্রস্তর-যুগের পর তাম্র-যুগ, তারপর লৌহ-যুগ। দক্ষিণ ভারতে প্রস্তর যুগের পরই লৌহ যুগ, তাম্র যুগ সেখানে অনুপস্থিত। ইউরোপের কোনও কোনও দেশে প্রস্তর যুগের পরই আসে ব্রোঞ্জ যুগ। নীলনদ, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস ও সিন্ধুনদ উপত্যকায় তাম্র ব্রোঞ্জ যুগে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

নগরের উদ্ভব ঃ তামা বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার মানুষ শিখল স্বাভাবিকভাবেই, তার জীবনযাত্রায় দেখা দিল পরিবর্তন। ধাতু দিয়ে যারা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি ক'রতে পারত, তারা ছিল বিশেষজ্ঞ কারিগর। খনি থেকে ধাতু তোলা, চুল্লীতে গালানো, ঢালাই করা, খাদ মেশানো, গড়ে পিটে হাতিয়ার তৈরি করা—এ সমস্ত কাজে শুধু ধাতুবিজ্ঞানের জ্ঞান আর বুদ্ধি হ'লেই চলত না, প্রয়োজন ছিল, নানা নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। নূতন আবিষ্কৃত ধাতু লাগল চাষের কাজে লাঙলের তীক্ষ্ণতা বাড়াতে, যানবাহন তৈরির কাজে, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র আর অলঙ্কারাদি গড়ার কাজে। নূতন নূতন কারিগর দেখা দিল, যেমন সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, খোদাইকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি। কারিগরী শিল্প যত উন্নত হ'তে লাগল, কাঁচামাল আমদানি আর পণ্যদ্রব্য রপ্তানি তত বাড়তে লাগল। এই আমদানি-রপ্তানি করার কাজে লাগল বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণী। ধাতু ছিল অতি মূল্যবান্ বস্তু সেকালে। ধাতুর মালিক ছিলেন সাধারণতঃ রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী অথবা মন্দিরের পুরোহিতশ্রেণী। শাসক বা পুরোহিতের পৃষ্ঠপোষকতায় কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমশঃ এগিয়েছিল। শাসকের শাসনকেন্দ্র বা পুরোহিতের মন্দিরকে ঘিরে বসতি ছিল ওই বণিকদের। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে এসেছিল সমৃদ্ধি আর বিলাসব্যসন। পাকা বাড়ী, পাকা রাস্তা, জলনিকাশের ব্যবস্থা, সারি সারি কারিগর আর ব্যবসায়ীদের অতি ব্যস্ত কর্মকেন্দ্র, মন্দিরের পূজা-আরতি আর শাসকের নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে গড়ে উঠল নগর। নগরবাসীরা তাদের খাদ্যের জন্যে নির্ভরশীল ছিল গ্রামের ওপর। নদীবাহিত পলিমাটিতে উর্বর জমিতে চাষী যে ফসল ফলাতো, তাতে গ্রামের চাহিদা পূরণ করেও আরও উদ্‌বৃত্ত থেকে যেত। এই উদ্‌বৃত্ত ফসলের যোগান নগরের মানুষের চাহিদা পূরণ ক'রত। তাই নিশ্চিন্তে মনোযোগ দিতে পেরেছিল কারিগর তার যন্ত্রপাতির কাজে আর বণিক তার বেচাকেনার কাজে। ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত

উৎপাদনের উপর ভিত্তি ক'রে নীল, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস আর সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক বা একাধিক গ্রাম থেকে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল শহর বা নগর।

সামাজিক পরিবর্তন ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব : ধাতু যুগে যেমন নগরে, তেমনি গ্রামে দেখা দিয়েছিল শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ থেকে জন্ম নিয়েছিল শ্রেণীবিভাগ। শ্রমবিভাগ আগেও ছিল। তামা-ব্রোঞ্জ যুগে জীবিকা উপায়ের উন্নতির ফলে এই বিভাগ আরও স্পষ্ট চেহারা নিল। গ্রামে যে পশুপালন করে, সে কৃষিকাজ করে না ; যে কৃষিকাজ করে, কুটীরশিল্প তার কাজ নয়। শহরে নগরে শাসক, পুরোহিত, বণিক, শিল্পী, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী ছিল পৃথক পৃথক কাজে যুক্ত। ধাতুযুগে সভ্য সমাজ যতই গড়ে উঠতে লাগল, শ্রেণীবিভেদ বাড়তে থাকে ততই। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল শাসক, পুরোহিত আর বণিক, সুবিধাবঞ্চিত ছিল কৃষক ও শ্রমিক, যারা ক্রমে ক্রমে দাসে পরিণত হ'য়েছিল।

শ্রমবিভাগের আর একটি ফল—পরিবারের উৎপত্তি। আগে নারী ছিল সমাজের কেন্দ্রে। ধাতুর যুগে জীবিকার উপায়ে উন্নতি দেখা দিলে পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধবিগ্রহ, হলচালনা, কারিগরী ধাতুশিল্প ইত্যাদি কঠিন কাজে যোগদান করে। নারী হ'ল পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। নারী ঘরকন্নার কাজে মন দিল। বিবাহ প্রথার প্রচলন হ'ল। পিতা মাতা সন্তান নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের ছিল নিজস্ব জমিজমা, সম্পত্তি। পরিবারগুলি আলাদা হলেও বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে, তারা এক হ'ত গোষ্ঠী-বদ্ধ ভাবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও গোষ্ঠী-চেতনা কাজ করত। গোষ্ঠীর 'টোটেম' (বা 'প্রতীক') ছিল বিশেষ কোনও উদ্ভিদ বা জীবজন্তু, অত্যন্ত পবিত্র ছিল তার স্থান। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও 'টাবু' বা সামাজিক আচারনিয়মের বিধিনিষেধ ছিল। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব দেখা দিত সময় সময়। সে কারণে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব

দেবার জন্যে একজন নায়ক বা সর্দার গোছের লোক নির্বাচিত হ'ত। গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার ক'রত। বিজয়ী গোষ্ঠীর নেতা বিজিত গোষ্ঠীর নেতার প্রভু হ'ত। এমনি ক'রে কোনও গোষ্ঠী নেতার শক্তি ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে, সে একটি ভূখণ্ডের মালিক, প্রভু বা রাজা হতে পারত। যুদ্ধে পরাজিত বন্দীরা দাসে পরিণত হ'ত।

রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের উৎপত্তিঃ শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগের ফলে এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের কাজ ছিল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা। এই শ্রেণীর ওপর সমাজের মানুষ বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নির্ভর করত। গোষ্ঠীনেতারা এই যোদ্ধা শ্রেণীর নেতৃত্ব দিতেন, আগেই বলা হয়েছে। পরিবারের সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাবার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে। তখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরা মিলিত হয়ে আইনশৃঙ্খলারক্ষার ভার দেয় তাদের নেতাকে। যে নেতার কাজ ছিল আগে শত্রুকে বাধা দেওয়া, তার কাজ হল দেশ শাসন করা। রাজতন্ত্রের উদ্ভব হ'ল এইভাবে। রাজাকে তার যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশশাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করবার জন্যে প্রজারা খাজনা বা কর দিত। একজন রাজা, তাঁর অধীনে একটি দেশ আর সেই দেশের অনুগত প্রজাদের নিয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। রাজার একার পক্ষে শাসন করা সম্ভব ছিল না। তাঁকে সাহায্য করতেন মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত, আরও অন্যান্য রাজকর্মচারী। এমনিভাবে গড়ে ওঠে সরকার—রাষ্ট্রের এটি একটি প্রধান অঙ্গ। সরকার যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠল, তাঁরা শাসক শ্রেণীর মধ্যে পড়লেন। যোদ্ধ-শ্রেণী, আমাদের দেশে যাদের বলা হ'ত ক্ষত্রিয়, আর পুরোহিত-শ্রেণী শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল। শাসকশ্রেণীর বাইরে পড়ে রইল বণিক, শিল্পী, শ্রমিক আর কৃষক। আগে সমাজে শ্রমবিভাগের ফলে দেখা গিয়েছিল নানা জীবিকার ভিত্তিতে নানা শ্রেণী। রাষ্ট্র গড়ার পর দেখা দিল দুটি শ্রেণী—শাসক শ্রেণী, যারা শাসন করত, আর শাসিত শ্রেণী

যাদের শাসন করা হ'ত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণীকে প্রায়ই শোষণ ক'রত।

কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, বণিকের চেষ্টায় দেশে যে সম্পদ গড়ে উঠত, তার প্রায় সমুদয় অংশ ভোগ করবার লোভে শাসকশ্রেণী ক্রমশঃ শোষকে পরিণত হয়। রাজা হ'লেন এই শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁর প্রধান কাজ হ'ল লক্ষ্য রাখা, যাতে শাসিত শ্রেণীর মধ্যে সব জীবিকার মানুষ মন দিয়ে নিজের নিজের কাজ করে যায়, দেশের সম্পদে কোনও ঘাটতি না পড়ে। প্রয়োজনমত আইন করে সরকারী কড়া পাহারায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হ'ত। উৎপাদন কতটুকু হয়, তার হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় রাখত সরকার।

আগেই বলেছি, নদী-উপত্যকা অঞ্চলেই তাম্র-ব্রোঞ্জ-যুগে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রাম ও নগর জীবনের পার্থক্য, জীবিকা-উপায়ের উন্নতিতে শ্রমবিভাগ, শ্রমবিভাগের পরিণতি শ্রেণী-বিভাগ, সুবিধাভোগী ধনিক-শ্রেণীর উদ্ভব আর সুবিধা-বঞ্চিত দাস-শ্রেণীর আবির্ভাব।

নদী-উপত্যকায় সভ্যতা কেন গড়ে উঠল? তার কারণ, নদীতীরে সেচের ব্যবস্থা ছিল। নদী-বাহিত পলি-মাটিতে উর্বর শস্যক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী উৎপাদন করা যেত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন তাদের ভরণ-পোষণে লাগত, যারা সরাসরিভাবে কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাই, নিশ্চিন্ত ভাবে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী—শাসক, পুরোহিত, বণিক, শিল্পী—নিজেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারত। সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। জলপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতা

[খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খৃস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ পর্যন্ত]

৪.১। মেসোপটেমিয়া

(ক) **মেসোপটেমিয়ার অবস্থান ও প্রথম সভ্যতার উন্মেষঃ** আরব দেশের উত্তরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী দেশের নাম মেসোপটেমিয়া (বর্তমানে ইরাক)। এই 'মেসোপটেমিয়া' নামটি গ্রীকদের দেওয়া—এর অর্থ হ'ল দু' নদীর মধ্যবর্তী দেশ। এই দেশটির উত্তরাংশের প্রাচীন নাম ছিল **আসিরিয়া** ও দক্ষিণাংশের নাম **ব্যাবিলন**। আবার, ব্যাবিলনের ছিল দুটি অংশ—উত্তরে **আক্কাদ**, দক্ষিণে **সুমের**। সুমের ছিল এরিদু, ইরেক, লাগাশ, উর প্রভৃতি কয়েকটি নগররাষ্ট্রের সমষ্টি। এখন থেকে পাঁচ ছ' হাজার বছর আগে পৃথিবীর যে কয়েকটি জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হয়, তাদের মধ্যে সুমের অন্যতম।

(খ) **জমির উর্বরতা ও শস্য-উৎপাদন-ব্যবস্থাঃ** সুমের অঞ্চলের জমি ছিল খুবই উর্বর। শস্যের ফলনও ছিল প্রচুর। এখানকার বিভিন্ন নগরের মধ্যে শস্যভাণ্ডারের অবস্থিতি দেখে অনুমান করা চলে, এ অঞ্চলে চাষের উন্নতি হয়েছিল। যব ও একজাতীয় গম প্রধান ফসল ছিল। ইরেক শহরের চারদিকে পাওয়া গেছে, মাটির দেওয়াল, আর দেওয়াল গড়ার সময় মাটি কেটে নেবার ফলে তৈরি পরিখা। এছাড়া জমিকে উর্বর করে তোলার জন্যে জমির ভেতর ছিল সেচখাল। মনে হয়, দেওয়াল, পরিখা এবং সেচখাল থাকায় নদীর বন্যার কবল থেকে শহর রক্ষা পেত।

(গ) **বন্যা-প্রতিরোধঃ** আনাতোলিয়ার পাহাড়ে বরফ গলতে শুরু করলেই ইউফ্রেটিস নদীতে বন্যা হ'ত। এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে সাধারণতঃ এই বন্যা হ'ত। তবে নির্দিষ্ট করে কেউ জানত না, কখন নদীতে বান আসবে। জলনিকাশের জন্যে ও সেচের উদ্দেশ্যে

অসংখ্য ছোট-বড় খাল খনন ক'রে বন্যার জল থেকে চাষের জমি বাঁচানো হ'ত।

(ঘ) **বিভিন্ন বৃত্তি:** নগরবাসীদের মধ্যে ছিল বিপুলসংখ্যক মজুর ও কারিগর। অনেক রকমের শিল্পের পত্তন হয়েছিল। মৃৎশিল্পের **প্রথম** যুগান্তর ঘটে সুমের দেশে। এখানকার কুম্ভকার মাটির খুরি, কলসী ইত্যাদি গড়বার জন্যে চাকা ব্যবহার করত। কাপড় বোনবার জন্যে ছিল তাঁতী। তামার বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করার জন্যে ছিল কর্মকার—এরা কুড়ুল, কোদাল, ছোরা, ছুরি, বর্শা, সৈনিকদের মাথায় পরার জন্যে তামার টুপি ইত্যাদি তৈরি করত। সূত্রধর নৌকা, যুদ্ধরথ প্রভৃতি ছাড়াও বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে পারত। রাজমিস্ত্রীরা অট্টালিকা, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করত। এছাড়া জহুরী, ভাস্কর, সৈনিক, বণিক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মানুষ ছিল সুমের দেশে।

(ঙ) **সুমেরীয়দের কীর্তি:** পৃথিবীতে অন্যতম প্রাচীন নগর সভ্যতা সৃষ্টির কৃতিত্ব সুমেরীয়দের। সুমেরে যে সমস্ত নগর পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব দেবতা এবং পুরোহিত থাকত। মাঝে মাঝে এক এক শহরের শাসক অপর শহর আক্রমণ ক'রে নিজের আধিপত্য বিস্তার করত।

শহরের মানুষেরা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। তারা মাথা কামাত এবং হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো এক রকমের পশমের পোশাক পরত। খাদ্যদ্রব্যও ছিল খুবই সাধারণ।

গৃহ-নির্মাণ-শিল্পে সুমেরীয়রা ছিল খুবই দক্ষ। কাদামাটি দিয়ে ইঁট তৈরি করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে তারা বড় বড় মন্দির গড়ত। নিপ্পুরে পাওয়া ইঁটের বিরাট সৌধটি প্রাচীন সুমেরীয়দের কীর্তি। ইরেক শহরের জিগ্গুরাট (সুমেরের নগরদেবতার মন্দির)-এর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, মন্দিরটি চারবার নূতন করে গড়ে তোলা হয়েছিল, প্রত্যেকবারই আগের চেয়ে জমকালো ভাবে।

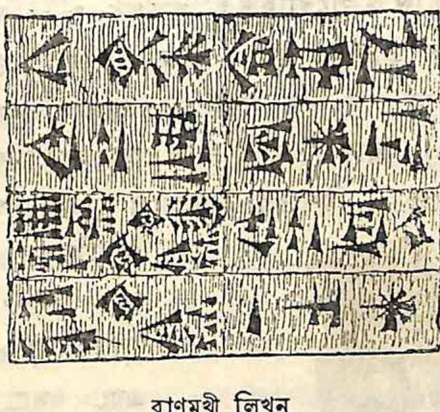
এখানে সুমেরীয়রা একটি কৃত্রিম পাহাড়ও গড়ে তুলেছিল, যার গায়ে প্রথম দিকে পোড়ামাটির খুরি এবং পরের দিকে মোচাকৃতি পাত্রে লাল, কালো, সাদা রং দিয়ে সাজান হয়েছিল। মন্দিরের দেওয়ালে আগে ছিল কাদামাটির তৈরি জন্তুজানোয়ারের মূর্তি। শেষের দিকে পাথর ও ঝিনুকের, আরও পরে তামার। জিগ্‌গুরাটটি ছিল ঠিক নগরের মাঝখানে। মন্দির ছাড়াও ছিল শস্যাগার, অস্ত্রাগার ও কামারশালা। মন্দিরের দেওয়ালের ভেতরকার সাজসজ্জার মধ্যে নগরবাসীর অনেক শিল্পকর্মের চিহ্ন আছে। খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের **তেল উকের** নগরের মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালের গায়ে আঁকা পশু ও মানুষের রঙীন ছবি উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে। যে ফলকগুলিতে মন্দিরের হিসাব লেখা আছে, সেগুলি পাঠ করা গিয়েছে। এইগুলি ঐতিহাসিক কালের দলিল। এর থেকে সেকালের সুমের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

সুমের দেশে মণিমুক্তার কাজ করার জন্যে এক জহুরী-শ্রেণী ছিল, যারা মণিমুক্তা ফুটো করে পুঁতি বানাতে পারত এবং ওগুলোর গায়ে চিহ্ন বসাতে পারত। ভাস্করেরা চুনাপাথর বা ব্যাসল্ট পাথর কেটে কেটে মূর্তি গড়ত। তারা ব্রোঞ্জ, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতু ব্যবহার করত। লোহার ব্যবহার তাদের জানা ছিল না। তারা ছিল তাম্রযুগের মানুষ। **লগস** নামে নগররাষ্ট্রে একটি রূপার তৈরি বড় পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মাঝখানে উৎকীর্ণ একটি সিংহ মুখ ঈগল দুটি পক্ষ বিস্তার করে রয়েছে এবং দু' পাশে উৎকীর্ণ দুটি সিংহের পশ্চাদ্‌দেশ নখের দ্বারা স্পর্শ করে আছে। এটি শিল্পীর অপূর্ব কীর্তি। পাথর কেটে সীল তৈরি করবার উদাহরণও পাওয়া যায়। **মারির** প্রাসাদের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রাবলী সে যুগের অসামান্য শিল্পনিদর্শন।

শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী সুমের দেশে যে সব জিনিস পাওয়া যেত না, সেগুলি অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হ'ত। যেমন, তামা আসত পারস্য উপসাগরের দক্ষিণাঞ্চল

থেকে, টিন আসত ইরাণ, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান থেকে। শুধু যে কাঁচামালের লেনদেন হ'ত, তা নয়। এক নগরের শিল্পজাত দ্রব্য অন্য নগরে বিক্রয় হ'ত। এইভাবে এক বিরাট বাণিজ্যিক লেনদেন চলত নানা দেশের সঙ্গে, সাগর-পাহাড় পেরিয়ে। টাইগ্রিস থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত গোটা অঞ্চল একটি বাণিজ্যসূত্রে যেন গাঁথা ছিল। সোনা, রূপা বা মূল্যবান পাথরের বিনিময়ে এই বাণিজ্য চলত। বড় বড় পালতোলা নৌকা বা জাহাজে নদী বা সমুদ্র পারাপার করা হ'ত।

অতি প্রাচীন যুগেই সুমেরে একটি সুন্দর লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। তারা কাগজের ব্যবহার জানত না। কাঁচা



বাণমুখী লিখন

কাদার টালির ওপর একটি সুঁচালো কাঠি দিয়ে লেখা হ'ত, তারপর সেই টালিকে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হ'ত। ঐ লিখনের৷ নাম **বাণমুখী লিখন**। ঐ লিখনের প্রায় ত্রিশ হাজার টালি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার একটি গ্রন্থাগারের অংশ বলে মনে হয়।

৪·২। প্রাচীন শহর

(ক) **অবস্থিতি ও ভূ-প্রকৃতি ঃ** মিশর দেশটি খুবই ছোট, বিশাল সাহারা মরুভূমির মধ্যে একটি মরূদ্যান মাত্র। এই দেশের

দু'দিকে সাগর—উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে লোহিত সাগর। সুবিখ্যাত নীলনদের মোহানায় ব-দ্বীপের ওপর মিশর অবস্থিত। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে নীলনদের উৎসস্থান ইথিওপিয়ার মালভূমিতে যখন বর্ষা নামত, তখন নদীর বুকে বান ডাকত। নীলনদের দু' কূল জলে ভাসলে পলিমাটির প্রলেপ পড়ত দু' পাশের জমিতে। তার ফলে মিশর হয়েছিল উর্বর কৃষিক্ষেত্র। এজন্যেই গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছিলেন, **"মিশর নীলনদের দান"**। অতি প্রাচীনকালে বহু জায়গায় মানুষ এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে, আর কালক্রমে গড়ে তোলে একটি উন্নত সভ্যতা।

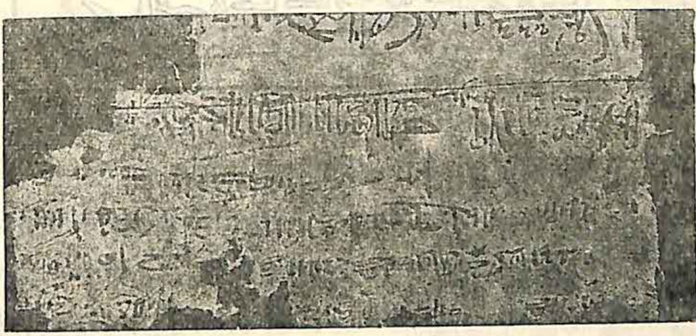
(খ) **ফ্যারাও ও পুরোহিত ঃ** খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের মধ্যেই মিশরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজাদের বলা হ'ত **ফ্যারাও**। ('ফ্যারাও' কথার অর্থ 'বড় বাড়ী' বা প্রাসাদ যেখানে রাজারা বাস করতেন।) প্রায় তিন হাজার বছর ধরে মিশরে ফ্যারাও-দের রাজত্ব চলে। মিশরের ইতিহাসে তিনটি যুগ ধরা হয়—



খুফু

পিরামিডের যুগ (খৃঃ পূঃ ৩০০০—২০০০), সামন্ত যুগ (খৃঃ পূঃ ২০০০—১৫৮০) এবং সাম্রাজ্যের যুগ (খৃঃ পূঃ ১৫৮০—১১৫০)। পিরামিড যুগের চতুর্থ রাজ-বংশের ফ্যারাও খুফু গিজের প্রান্তরে প্রথম তাঁর বিশাল পিরামিড বা সমাধিস্তূপ নির্মাণ করেন। তাঁর পরবর্তী ফ্যারাও খাফ্রা নির্মাণ করেন দ্বিতীয় পিরামিড। ঐ সব পিরামিড পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। প্রাচীন রাজ্যের শেষ ফ্যারাও দ্বিতীয় পেপি নব্বই বছর রাজত্ব করেন। পৃথিবীর খুব কম রাজাই এতদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন।

সুমের দেশের পুরোহিতরাই ছিলেন শাসকগোষ্ঠী। মিশর দেশে কিন্তু মন্দিরের পূজারীরা বা পুরোহিতেরা ঠিক শাসক ছিলেন না। তবে, তাঁদের প্রতিপত্তি ছিল অসীম। স্বয়ং ফ্যারাও ছিলেন পুরোহিতদের অধিনায়ক।



প্যাপিরাসের ওপর লিখন

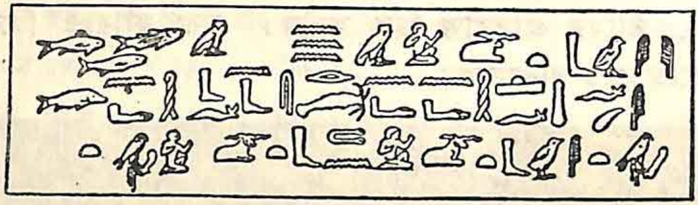
(গ) **মিশরী বর্ণমালা ও প্যাপিরাস ঃ** মিশরে শিশুরা পোড়া-মাটি বা পাথরের ফলকে প্রথমে লেখা অভ্যাস করত; পরে **প্যাপিরাসে** লিখত। প্যাপিরাস একরকমের লম্বা শরকাঠি। এগুলিকে ছেঁচে চ্যাপ্টা করে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে লম্বা মাদুরপটের মত করা হ'ত, তারই ওপর কালিকলম দিয়ে লেখা হ'ত। এগুলিই **প্যাপিরাস** নামে খ্যাত। এর থেকেই ইংরাজী পেপার (কাগজ) শব্দ এসেছে।



মিশরীয় লেখক

মিশরে ছেলেরা বড় হয়ে প্যাপিরাসের ওপর সমস্ত দলিল-পত্র ও ফ্যারাওদের কথা লিখত। পিরামিডের ভেতর থেকে অসংখ্য প্যাপিরাস পাওয়া গিয়েছে। এগুলি মিশরীয় ইতিহাসের একটি প্রধান উপকরণ। এগুলি সবই ধ্বনি চিত্র। এর এক-একটি চিত্র এক-একটি ধ্বনির প্রতীক। যেমন, ক-ধ্বনির জন্যে একটি চিত্র, খ-ধ্বনির জন্যে একটি চিত্র ইত্যাদি। অধিকাংশ প্যাপিরাসে চব্বিশ অক্ষরের বর্ণমালার

ব্যবহার হ'ত। মিশরী বর্ণমালার প্রথম পাঠোদ্ধার করেন শঁপোলিয় নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত।



মিশরের চিত্রলিপি

(ঘ) **রাজস্ব-আদায়-কারী ও 'সৈনিক'-শ্রমিক ঃ** মিশরে কৃষি-জমিগুলির মালিকানা ছিল ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজার। অতএব, জমির উৎপন্ন শস্যও ছিল রাজার নিজস্ব সম্পত্তি। রাজা জমির খাজনা আদায় করতেন। তিনি একদল সামরিক শাসক নিয়োগ করতেন। এদের কাজ ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির দেখাশোনা করা, সেচখালের জলসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা এবং যাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হ'ত, তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা।

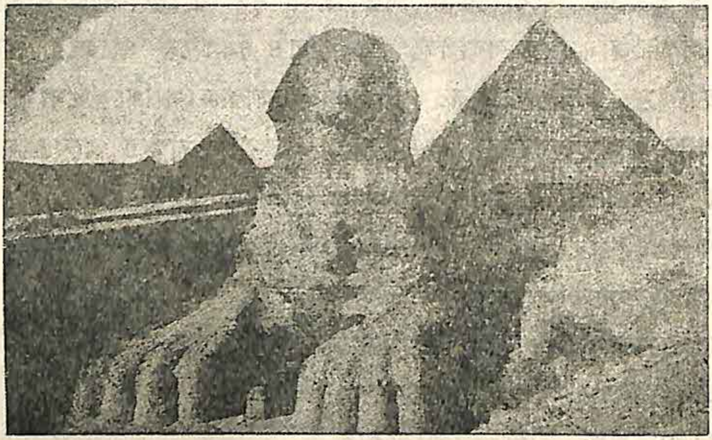
(ঙ) **বাণিজ্য ঃ** খৃস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে মিশরে রাজারাই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালনা করতেন সরাসরি সেনা-বাহিনীর সাহায্যে। বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ছিল, ব্যক্তিগত নয়। এখানকার বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ বিলাসের প্রয়োজনে। ম্যালাকাইট নামে একরকমের পাথর, মণিমুক্তা, সোনা, মশলাপাতি, মন্দিরে জ্বালানোর ধূপ, মমি-রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় তেল, ভাল কাঠ ইত্যাদি মিশরে পাওয়া যেত না। এগুলি আমদানি করার জন্যে রাজকীয় সৈন্যদলের পাহারায় বাণিজ্য-অভিযান পাঠান হ'ত। সমুদ্রপথে মিশরী নৌবহর বাণিজ্য করতে যেত সিরিয়ার উপকূলে। স্থলপথে অথবা জলপথে বাণিজ্য চলত লোহিত সাগরের তীরে 'পুন্‌ত্' নামে এক দেশে। মিশরের প্রধান বন্দর ছিল 'বাইব্‌লস'। নুবিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও ক্রীতদাস সংগ্রহ করার জন্যে মাঝে মাঝে নৌবহর পাঠান হ'ত। বাণিজ্যের ফলে নূতন একটি শ্রেণী তৈরি হয়েছিল, যারা রাজকোষের অর্থে প্রতিপালিত হ'ত।

(চ) **পিরামিড**ঃ মিশরীদের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পর মানুষ আর এক নূতন জীবন লাভ করে। এজন্য তারা মৃতদেহগুলিকে সযত্নে কবরের মধ্যে রেখে দিত এবং মৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকতে যে সব জিনিস ভালবাসত, সেইগুলিও সেখানে সাজিয়ে রেখে দিত। মৃতদেহটিকে একরকম সুগন্ধি আরক মাখিয়ে মোমলিপ্ত কাপড়ে জড়ানো হ'ত। ঐ রকম ভাবে রক্ষিত শবের নাম **মমি**। তারপর ঐ মমিকে মানুষের আকারে তৈরি একটি বাক্সে পূরে কবরের ভেতরে রেখে দেওয়া হ'ত। ফ্যারাওদের কবর হ'ল 'পিরামিড'। প্রাচীন যুগের চতুর্থ রাজবংশের ফ্যারাও খুফু বর্তমান কায়রোর কাছে নীলনদের পশ্চিমে গিজের প্রান্তরে প্রথম তাঁর বিশাল পিরামিড বা সমাধি-স্তূপ নির্মাণ করেন।


মমি

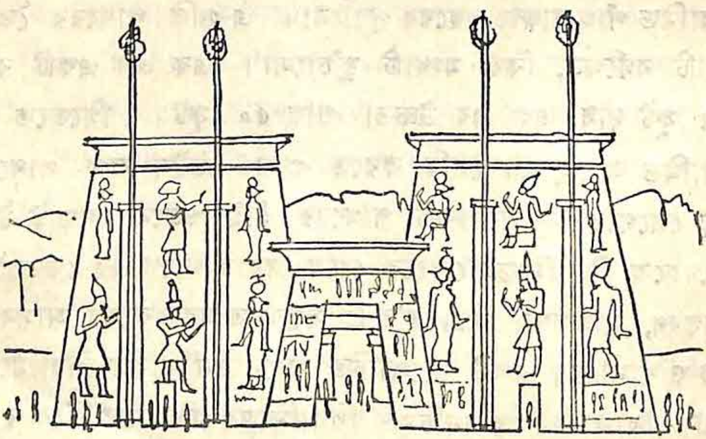
পরবর্তী ফ্যারাও নির্মাণ করেন দ্বিতীয় পিরামিড। ঐ সব পিরামিড পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। এ-গুলি পাথরের তৈরি, তলাটি বর্গক্ষেত্র, কিন্তু মাথাটি ছুঁচালো। এক এক একটি বাহু ৭৫৫ ফুট দীর্ঘ এবং এর উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। গিজেতে যে পিরামিড আছে, তা তৈরি করতে প্রায় তেইশ লক্ষ পাথরের চাঁই লেগেছে। প্রত্যেকটি পাথরের চাঁই ওজনে আড়াই টন। মৃতদেহকে পিরামিডের ভেতরে রেখে দেবার আগে এর ভেতরটার অলঙ্করণ, সাজসজ্জা করা হ'ত। সম্ভবমত সব রকমের আসবাব, খাদ্য ও পানীয়ের একটি রাজোচিত আয়োজন থাকত পিরামিডের মধ্যে। রাজাদের জীবনচিত্রও পিরামিডের দেওয়ালে এঁকে রাখা হ'ত। মিশরে ঐ রকম ছোটবড় অসংখ্য পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়। গিজের পিরামিডের পাশে এক বিশাল প্রস্তরময় সিংহদেহ মানবমূর্তি আছে, তার নাম **স্ফিংক্স**।

পিরামিডের ভেতর থেকে ফ্যারাওদের মমি এবং তাদের ব্যবহৃত বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছে। ফ্যারাও টুটেন-খামেন ও তাঁর রাণীর



মিশরের স্ফিংক্স ও পিরামিড

কবর থেকে পাওয়া গেছে সোনা-রূপায় মোড়া চেয়ার, কারুকার্য-করা পালঙ্ক, গহনার বাক্স প্রভৃতি। প্রাচীন মিশরে শিল্পকলা কত উন্নত ছিল, তা এই সব জিনিস থেকে বোঝা যায়।



মিশরীয়দের মন্দির

(ছ) ধর্মবিশ্বাস ঃ প্রাচীন মিশরীয়দের সমাজে ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। তাদের প্রধান দেবতা ছিল আকাশ, নীলনদ, সূর্য এবং

পৃথিবী বা দেশের মাটি। কারণ, এদের ওপরেই তাদের জীবন, তাদের কৃষিসম্পদ নির্ভর করত। পিরামিডের লিপি থেকে জানা যায় যে, সূর্যদেব 'আতুম' নিজের থেকে সৃষ্ট হয়ে সৃষ্টি ক'রেছিলেন বায়ুর দেবতা 'সু' ও জলের দেবী 'তে ফনুত'-কে। তাঁরা আবার জন্ম দিলেন পৃথিবীর দেবতা 'গেব' ও আকাশের দেবী 'নাত্'কে। তাঁদের থেকে সৃষ্ট হন 'ওসিস', 'ওসিরিস' ও আরও অন্যান্য দেবদেবী।

আকাশের অধিপতিকে মিশরীয়রা উত্তর-রাজ্যে বলত 'রা', দক্ষিণ রাজ্যে বলত 'আমন'। নীলনদের অধিপতি ছিলেন 'ওসিরিস'। মাটির দেবী ছিলেন 'আইসিস', আর 'হোরেস' ছিলেন সূর্যদেব। তারা ষাঁড়, কুমির, বিড়াল, বাজপাখী প্রভৃতি পশুপাখীর পূজাও করত। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা অনেক সময় এই সব পশুপাখীর রূপ ধরে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। প্রধান দেবতাদের জন্যে তারা বড় বড় মন্দির গড়েছিল। কার্ণাকে ফ্যারাওদের তৈরি অসংখ্য মন্দির আছে। তাছাড়া হেলিপোলিস, থিবিস প্রভৃতি নগরীতেও অনেক মন্দির ছিল। মন্দিরের গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা থাকত। মন্দিরের পূজারীর প্রতিপত্তি ছিল অসীম।

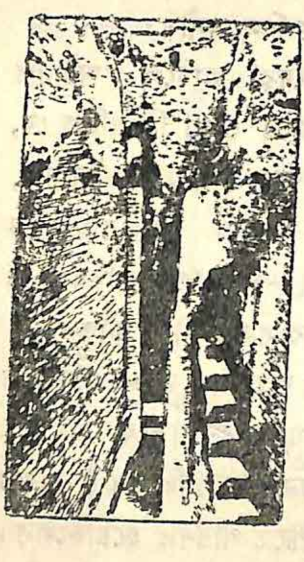
(জ) **প্রধান প্রধান বৃত্তি ঃ** ফ্যারাওদের আমলে (অষ্টাদশ বংশের রাজত্বে) একবার আদমসুমারি করে দেখা গিয়েছিল যে, মিশরের জনগোষ্ঠীকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—সৈনিক, পুরোহিত, রাজার ভূমিদাস এবং কারিগরী শিল্পী। কিন্তু বাদ পড়ে গিয়েছিল ওতে মিশরের আর দুটি শ্রেণী—ফ্যারাওর পরিবার ও দরবারকে নিয়ে গঠিত অভিজাত শ্রেণী আর সবার নীচে ক্রীতদাস।

বলা বাহুল্য, দেশশাসন যাঁদের প্রধান বৃত্তি ছিল, তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন। যুদ্ধ-ব্যাপারে যাঁরা ফারাওকে ও তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহায্য করতেন, তাঁরা ছিলেন সৈনিক। মিশরে পুরোহিতরা একটি আলাদা শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের বৃত্তি ছিল ধর্মানুষ্ঠান। থিবিসের আমনদেবের পুরোহিত এঁদের নেতৃত্ব দিতেন। মিশরের সমস্ত জমির আইনতঃ মালিক

ছিলেন ফ্যারাও। কাজেই জমিতে যারা চাষ-বাস করত, সেই কৃষকরা ছিল ভূমিদাস। কারিগরী বৃত্তি যাদের ছিল, তাদের অবস্থা ভূমিদাসের মতই ছিল। কারিগর শ্রেণীর মধ্যে ছিল কুম্ভকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি। তাছাড়া, তামার বা সোনার খনিতে যারা কাজ করত, সেই শ্রমিকরাও উল্লেখযোগ্য। বয়নশিল্পী, তন্তুবায়, কর্মকার, ধাতুশিল্পী, প্রস্তরশিল্পী, কাঁচের কারিগর, স্থপতি প্রভৃতি সকলকেই কারিগরী বৃত্তিধারী শিল্পী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। ক্রীতদাসদের বিশেষ কোনও বৃত্তি ছিল না। যখন তাদের যে কাজে লাগানো হ'ত, সেইটি ছিল তাদের বৃত্তি। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রাচীন মিশরে বণিক বা ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

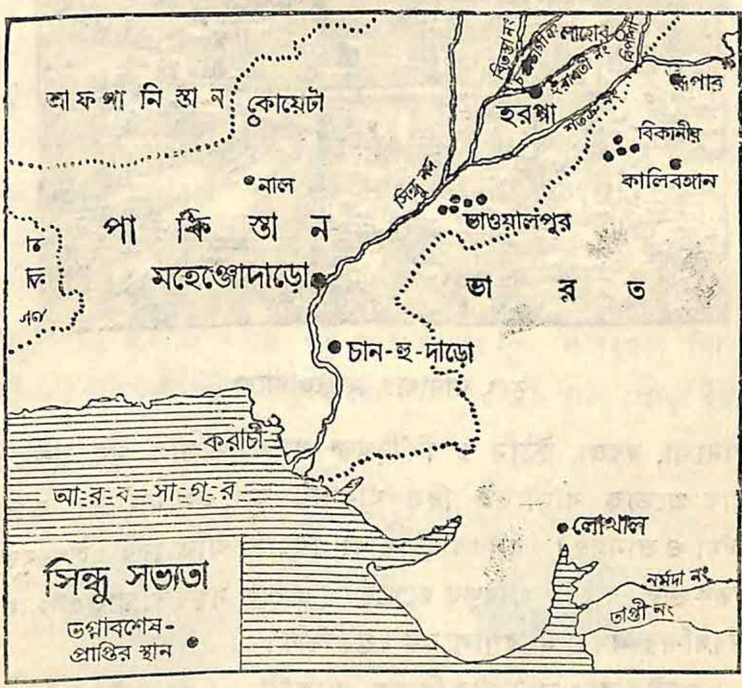
৪·৩। সিন্ধু উপত্যকা

(ক) **সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কার :** মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার মত ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় পাঁচ হাজার বছর বা তারও আগে একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায় (পাকিস্তানে) মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলায় (পাকিস্তানে) হরপ্পা নামক গ্রামে মাটির তলায় কয়েকটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গিয়েছে। ১৯২২ সালে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোর নগর-চিহ্ন খুঁজে পান। দয়ারাম সাহনি আবিষ্কার করেন হরপ্পা। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল এসব স্থানে খননকার্য পরিচালনা করেন।



হরপ্পা

মহেঞ্জোদারো বা 'মৃতের স্তূপ' নামে পরিচিত কয়েকটি ঢিবি খুঁড়ে বহু ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, সিন্ধু উপত্যকায় এক অতি প্রাচীন সুসভ্য জাতি বাস করত এবং তাদের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের জাতিগুলির যোগাযোগ ছিল। মার্শাল সাহেবের মতে, এই সিন্ধু সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো সভ্যতা। এখানে যে-সব সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, তার লেখার

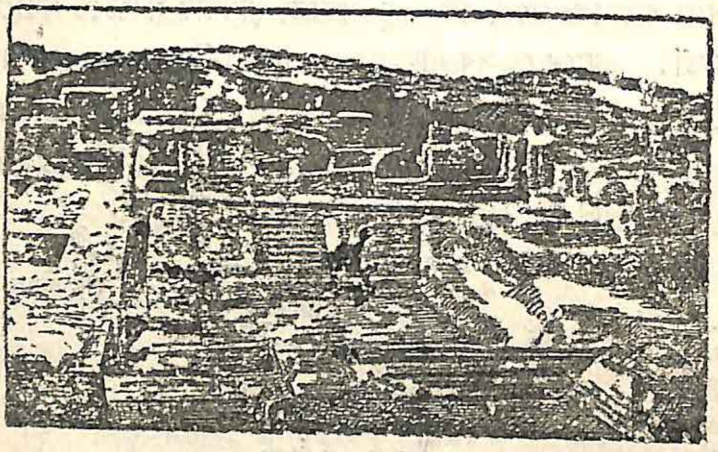


সিন্ধু সভ্যতা

অক্ষর এখনও কেউ পড়তে পারে নি, সেইজন্য এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাস জানা যায় না। এই নগরী অন্ততঃ সাতবার ধ্বংস হয়েছিল এবং নূতন ক'রে গড়ে উঠেছিল। ধ্বংসের কারণ সিন্ধু-নদের বন্যা। যাই হোক, ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে যা কিছু পাওয়া গেছে, সেই সব উপাদান থেকে সিন্ধু-সভ্যতার একটি ধারণা করা যায়।

(খ) **নগর-পরিকল্পনা**ঃ সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করত। তাদের সভ্যতা ছিল

নগরভিত্তিক। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার নগরপরিকল্পনা ছিল অতি আধুনিক। রাজপথগুলি ছিল চওড়া এবং সোজা। রাস্তার দু'ধারে ছিল পোড়া ইটের বাড়ীর সারি। বাড়ীগুলির মেঝে এবং দেওয়াল ছিল অত্যন্ত মসৃণ। বাড়ীগুলি ছিল একতল, দ্বিতল, ত্রিতল পর্যন্ত।



বৃহৎ স্নানাগার, মহেঞ্জোদারো

জানালা, দরজা, উঠান ও সিঁড়িযুক্ত বসতবাড়ীগুলি খুব সুন্দর। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ছিল বাঁধানো কূপ, জলনিকাশের জন্যে নর্দমা ও স্নানগৃহ। বসতবাড়ী ছাড়া বিরাট আকারের হলঘরযুক্ত কতকগুলি বাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির অথবা নগরপালকের দপ্তর ছিল।

নগরীর বৃহৎ স্নানাগার বিশেষ আকর্ষণীয়। ৬৫ মিটার দীর্ঘ ও ৩৬ মিটার প্রশস্ত এই স্নানাগারের চারদিকে ঘর ও দর্শকের বসবার আসন রয়েছে সারিসারি। জলাশয়ে নামবার জন্যে সিঁড়ি রয়েছে দু' দিকে। সাঁতারের জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে। নগরীর প্রত্যেক রাস্তার সঙ্গে রয়েছে বাঁধানো নর্দমা।

(গ) **খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঃ** সিন্ধু উপত্যকার মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল গম। অবশ্য যব ও খেজুরও তারা ব্যবহার করত। ভেড়া ও শূকরের মাংস, মাছ ও ডিম তারা খেত।

তূলো ও পশমের পোশাকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। নারী ও পুরুষ উভয়েই সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, তামা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের তৈরি গহনা ব্যবহার করত।

গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের মধ্যে মাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও রূপার তৈরি পাত্রাদির উল্লেখ করা যায়। চীনামাটির বাসনও তারা ব্যবহার করত। তাছাড়া সূঁচ, বড়শি, চিরুণী, কুড়ুল, কাস্তে, ছুরি, বাটালি, ক্ষুর প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অস্ত্রশস্ত্র তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর, হাড় ও হাতির দাঁতে তৈরি হ'ত। ওজন করবার জন্যে পাথরের বাটখারা ব্যবহার করা হ'ত। শিশুদের খেলনার মধ্যে চাকা-লাগানো গাড়ী ও চেয়ার পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ সে যুগে পাশা-খেলার প্রচলন ছিল।

(ঘ) **কারিগরী শিল্প ঃ** শিল্পী শ্রেণীর মধ্যে ছিল কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, স্বর্ণকার, হাতির দাঁতের শিল্পী, এবং পাথর কাটার কাজে পটু যারা। সে যুগে কারিগরী শিল্পে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। কুমোরের চাকায় তৈরি পাত্র, পোড়া ইঁট,



মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত জিনিসপত্র

হীরকের মত বিভিন্ন মূল্যবান পাথর ভেদ করা, বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে নূতন ধাতু তৈরি করা এবং ধাতুর ঢালাই ছাঁচ তৈরি করা থেকে বোঝা যায়, কতদূর উন্নতি হয়েছিল শিল্পে।

(ঙ) **বাণিজ্য:** পাঁচ শতেরও বেশী পোড়ামাটির ছোট ছোট 'সীল' পাওয়া গেছে। এই সীলগুলোতে নানা রকমের পশুমূর্তি ও



মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহর

চিত্রলিপি উৎকীর্ণ। এই সব সীল ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যবহৃত হ'ত। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা ভারতে ও ভারতের বাইরে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করত। তারা ভারতের বাইরে থেকে টিন, তামা, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি আমদানি করত। স্থলপথে এবং সম্ভবতঃ সমুদ্রপথেও এই বাণিজ্য চলত।

(চ) **ধর্মানুষ্ঠান:** সিন্ধুদেশের মানুষদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মহেঞ্জোদারোতে কোনও দেবমন্দির পাওয়া যায় নি। সীলমোহরে আঁকা প্রতিকৃতি এবং কতকগুলি



পশুপতি শিব (মহেঞ্জোদারো)

মাটি বা ধাতু-মূর্তি থেকে জানা যায় যে, এখানকার মানুষ কোনও মাতৃ-দেবতার এবং শিবের মত কোন পুরুষ-দেবতার পূজা করত।

সর্প, বৃক্ষ ও পশু পূজার প্রচলন ছিল, তেমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহের সৎকার ছিল ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ।

(ছ) **সমাজে শ্রেণীভেদ :** মহেঞ্জোদারো নগরের বাড়ীগুলির গঠন-কৌশল ও আকার দেখে মনে হয়, শহরে ধনী ও দরিদ্র, উভয়েই বসবাস করত। সমাজ, মনে হয়, চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, বণিক ও শিল্প শ্রেণী, এবং শ্রমিক শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণীতে ছিলেন পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও যাদুবিদ্‌রা। যোদ্ধা শ্রেণীর নিদর্শন হ'ল তরোয়াল, নগররক্ষীর বাড়ী, দুর্গের প্রাচীর ইত্যাদি। বণিক-শ্রেণী, রাজমিস্ত্রী, খোদাই-কারক, শাঁখারী, তাঁতী, স্যাকরা ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ছিল। আর চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল মেহনতী মানুষ—যেমন, গৃহভৃত্য, চর্মকার, জেলে, চাষী প্রভৃতি।

৪.৪। চীন

(ক) **প্রাচীন চীনের অবস্থিতি ও চীন সভ্যতার আদিম কাল :** এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীর নানা দেশে সভ্যতা দেখা দেয়, তখন চীনের হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরেও প্রাচীন চীন জাতির প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে।

হোনান এবং মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে চীনের প্রস্তর যুগের সভ্যতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, এখানকার মানুষেরা গ্রামে বাস করত এবং শূকর প্রভৃতি পশু পালন করত। তারা পাথরের কুড়ুল, চারকোণা ছুরি, স্লেট-পাথরের বা হাড়ের তৈরি তীরের ফলা ব্যবহার করত। তারা সূতা পাকাতে বা মাটির জিনিস গড়তে জানত। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আমল পর্যন্ত তাদের সভ্যতায় বাইরের কোন প্রভাব পড়েনি। মনে হয়, চীনারা তাদের সভ্যতা অপরের সাহায্য ছাড়াই গড়ে তুলেছিল।

চীনের প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায়, সভ্যতার প্রথম যুগে পাঁচজন রাজা ছিলেন—ফুহসি, সেন-নুং, হুয়াংতি, ইয়াও এবং শুন্। ফুহসির সময়ে বিবাহ-পদ্ধতি, লিখন-প্রণালী, চিত্রবিদ্যা, পশুপালন ও রেশমকীট-পালনের প্রথা প্রচলিত হয়। সেন-নুং-এর আমলে লাঙল ও কৃষির প্রচলন হয়। হুয়াংতির সময়ে চীনারা চুম্বক, গাড়ীর চাকা এবং বাড়ী তৈরি করার জন্যে ইটের ব্যবহার শেখে। তিনি প্রজাদের মধ্যে জমি বিলি, বর্ষপঞ্জী রচনা এবং গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইয়াও ছিলেন একজন ধার্মিক রাজা এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক। শেষ রাজা শুন্-এর সময়ে হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধ করার ব্যবস্থা হয় এবং কৃষিকার্যের উন্নতি ঘটে। এই পঞ্চরাজের পরে রাজত্ব করেন সীয়া, য়িন, চাউ নামে রাজবংশগুলি।

(খ) চীনের কিংবদন্তী : প্রাচীন চীনে কিছু কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। একটি কিংবদন্তী অনুসারে পৃথিবীর আদি মানব ছিলেন পান-কু। তিনিই পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাঁর নিঃশ্বাস থেকে বায়ু ও মেঘ, কণ্ঠস্বর থেকে বজ্র, মাংস থেকে পৃথিবী (মাটি), চুল থেকে উদ্ভিদ, ঘাম থেকে বৃষ্টি এবং দেহকীট থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। পান-কু আঠারো হাজার বছর বেঁচেছিলেন।

পান-কু'র পর আঠার হাজার বছর রাজত্ব করেন 'তিয়েন হুয়াং', মানে 'স্বর্গ-সম্রাটেরা'। তাঁরা দেখতে ছিলেন ভীষণ, দেহটা সাপের মত। তার পরের যুগে আঠার হাজার বছর শাসন করেন 'তি হুয়াং', মানে 'পৃথিবীর সম্রাটেরা'। তাঁদের দেহ ছিল ড্রাগন, ঘোড়া, সাপের নানা অঙ্গ জুড়ে তৈরি। এর পরে আরো আঠার হাজার বছর রাজত্ব করেন 'জেন হুয়াং', মানে 'মানব-সম্রাটেরা'। এঁদের মুখটা ছিল মানুষের, কিন্তু দেহটা ড্রাগনের। এই তিনটি মহাযুগ পার হবার পর আরও দশটি যুগের কল্পনা চীন দেশে আছে। য়ূ-চাও আবিষ্কার করেছিলেন কেমন ক'রে বাড়ী-ঘর তৈরি করতে হয়, আর সুই-জেন প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিলেন। এমনি ক'রে চীনারা হলেন সভ্য, আরও সভ্য।

আগেই আমরা চীনদেশের প্রথম পাঁচজন রাজার কথা বলেছি। তাঁদের মধ্যে আদর্শ সম্রাট ছিলেন ইয়াও। তিনি যীশুখৃস্ট জন্মাবার দু'হাজার বছরেরও আগে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে চীন দেশে হ'য়েছিল এক ভয়ঙ্কর প্লাবন। কেউ আর বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকাতে পারে না। ডাক পড়ল ইঞ্জিনিয়ার কুন্-এর। তিনি ন' বছর ধরে চেষ্টা করেও বন্যার জল আটকাতে পারলেন না। ইয়াও-র পর স্থুন্ যখন রাজা হলেন, তাঁর আমলে কুন্-এর ছেলে ইউ-এর ওপর ভার পড়ল 'চীনের দুঃখ' হুয়াং (মানে, পীত) নদীর বন্যা রোধ করবার। ইউ ছিলেন একজন মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ন' বছর ধরে অনেক পরিশ্রম ক'রে হুয়াং নদীতে বাঁধ দিতে পারলেন, বন্যার ভয় দূর হ'ল চিরতরে। কৃতজ্ঞ চীন-বাসী স্থুন-এর পর ইউকেই রাজা করেছিলেন।

অনুনদ সভ্যতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) **অর্থনৈতিক জীবন:** প্রাচীন কালের সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল নদ-নদীর তীরে তীরে। নীলনদের তীরে মিশরের সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা, আর হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে চীনের প্রাচীন সভ্যতার আশ্রয় ছিল। যেদিন থেকে মানুষ পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের বদলে তামা অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি হাতিয়ারের ব্যবহার শিখল, সেদিন থেকে মানুষ সভ্য হ'ল। আর নূতন প্রস্তর যুগের পরেই এসেছিল যে তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগ, তারই নিদর্শন পাওয়া যায় নদীতীরের সভ্যতাগুলিতে। নীলনদ, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস আর সিন্ধুনদের তীরে এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে, সে সব থেকে মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

নদীতীরের জমিতে চাষের ব্যবস্থা ছিল ভালই। একে জমি পলিমাটিতে উর্বর, তার ওপর চাষের জন্যে জলের কোনও অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে নদীতে প্লাবন এলেই যা' কষ্ট। কিন্তু একবার নদীতে বাঁধ দিয়ে ফেলতে পারলে আর ভয় কি! চাষীরা মনের আনন্দে ফসল ফলাতে লেগে যেত। ধীরে ধীরে ফসলের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে, সারা বছর খেয়েও অনেক থেকে যায়। বাড়তি ফসল অবশ্য কাজে লাগত। গ্রাম থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়া হ'ত শহরে-নগরে। শহরে-নগরে থাকতেন রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কেরাণী, শিল্প-ব্যবসায়ীরা। তাঁদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের অবসর ছিল না, কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। তাই ভূমি-দাস বা ক্রীতদাসের মত চিরকাল যারা জমিতে কেবল চাষ-বাস করত, তাদেরই উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বাড়তিটুকুর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল শহুরে সমাজ বা নাগরিক সভ্যতা। আসলে, নীলনদ, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস ও সিন্ধুনদের তীরে যে শহর-নগর গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান কারণই ছিল চাষবাসের সুবিধা আর অধিক ফলন। নগর-শহরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা দেখে মনে হয় শহুরে মানুষেরা বা নাগরিকরা ছিলেন সমৃদ্ধ।

(খ) **সামাজিক জীবন:** মেসোপটেমিয়ার সমাজে বড়লোক আর গরীব লোক পাশাপাশি বাস করত। তা' ছাড়া ক্রীতদাসপ্রথা ছিল। মিশরের সমাজে দুটি শ্রেণী ছিল—শাসক আর শাসিত। শাসিত শ্রেণীর তলায় ছিল ক্রীতদাস। শাসক-শ্রেণীর চূড়ায় ছিলেন ফ্যারাও। ফ্যারাওকে দেবতা বলে মনে করা হ'ত। মহেঞ্জো-দারোতে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল, সেখানে চারটি শ্রেণী ছিল—বিদ্বান, যোদ্ধা, শিল্পী-ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক-মজুর। বিদ্বান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী এবং যাদুকর। যোদ্ধা-শ্রেণী যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার থেকে। প্রাচীন মিশরেও সৈন্যবাহিনীকে বিশেষ মর্যাদা

দেওয়া হ'ত। মেসোপটেমিয়ার বহু মন্দির আবিষ্কৃত হওয়ায় পুরোহিত-শ্রেণীর বিশেষ প্রাধান্য বোঝা যায়। শিল্পীরা গড়ত নগরের বড় বড় প্রাসাদ ও মন্দির, তৈরি করত মাটির, কাঠের, তামা-ব্রোঞ্জের নানা মূল্যবান পাথরের গহনা, বাসন, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। নাগরিক জীবনের বিলাসব্যসনের নানা প্রয়োজন মিটত এইভাবে। একস্থান থেকে আর এক স্থানে পণ্যদ্রব্য যাঁরা নদীপথে, সমুদ্রপথে অথবা স্থলপথে নিয়ে যেতেন এবং কেনা-বেচা করতেন, তাঁরাই ছিলেন ব্যবসায়ী। সিন্ধুসভ্যতায় যেমন, মিশর ও মেসোপটেমিয়াতেও তেমনি, শিল্পী-ব্যবসায়ীদের বিশেষ স্থান ছিল সমাজে। শ্রমিক-মজুর শ্রেণী, না থাকলে কারা গড়েছিল মেসোপটেমিয়ার মন্দির ও প্রাসাদগুলি, মিশরের সমাধিমন্দির পিরামিডগুলি আর সিন্ধুনদের তীরে বড় বড় রাস্তা, স্নানাগার আর অট্টালিকা-শ্রেণী। শিল্প ও বাণিজ্য খুব উন্নত হ'লেও নদীতীরের প্রাচীন সভ্যতার কৃষি ও পশুপালন জীবিকানির্বাহের উপায়-রূপে গণ্য ছিল।

চিত্রলিপির ব্যবহার প্রাচীন নগর-সভ্যতার একটি বিশেষ পরিচয়। চিত্র ও নানা চিহ্ন দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করবার পদ্ধতি জানা যায় সিন্ধুতীরে পাওয়া সীলমোহর থেকে, মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় মন্দিরের গায়ে খোদাই করা লেখা এবং সীলমোহর থেকে। জিনিস-পত্র ওজন করা হ'ত শেকেলে (ওজনের একক)। এর প্রয়োজন ছিল কেনা-বেচার জন্যে। চাষ-বাসের জন্যে সময়ের মাপ করা হ'ত। জ্যোতিষ-চর্চা ছিল। এসব থেকে গণিত-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হ'য়েছিল।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য তৈরি করে, এ বিশ্বাস ছিল না। মানুষকে নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির ওপর, এই ধারণা থেকে এসেছিল ধর্মবোধ। প্রকৃতি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে গাছপূজা, পশু-পূজা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিকে মাতৃদেবী-জ্ঞানে পূজা করা হ'ত।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগের সমাজ

(ক) **লোহার আবিষ্কার ও সমাজজীবনে লোহার প্রভাব :** তামাব্রোঞ্জযুগের পর লোহা-ব্যবহারের যুগ। লোহার ব্যবহার যে-দিন মানুষ প্রথম জেনেছিল, সে-দিন সভ্যতার পথে সে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবে জেনেছিল মানুষ লোহার ব্যবহার? এর ঠিক উত্তর দেওয়া মুশ্‌কিল। কারণ, আকরিক লোহার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল অনেক অনেক বছর আগে, যখন মানুষ মাটি খুঁড়ে তামার সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু খনি থেকে সদ্য-তোলা লোহাকে গলিয়ে শক্ত, মজবুত ধাতুতে পরিণত করতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। খৃস্টের জন্মের ছ'হাজার সাতশো বছর আগে সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলে 'তেল-চাগর-বাজার' নামে একটি জায়গায় প্রথম মানুষের তৈরি লোহার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু লোহার ব্যবহার ভালভাবে শুরু হ'তে আরও অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। মিশরের রাজধানী তেল-এল-অমরনা নামে একটি জায়গায় পাওয়া লিপি থেকে জানা যায় যে, মিশরের রাজার বিবাহে বধূকে যৌতুক-হিসাবে লোহার বালা দেওয়া হয়েছিল। সে খৃস্টের জন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগেকার কথা। তখনও প্রকৃত লোহা ছিল দুর্লভ, তাই খুব মূল্যবান। খৃস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ নাগাদ ভূমধ্যসাগরের তীরের দেশগুলিতে প্রকৃত লোহা তৈরির শিল্প গড়ে ওঠে। পশ্চিম এশিয়ায় হিটাইট ও মিটান্নি নামে দুই জাতি লোহার ব্যবহার বিশেষভাবে শুরু করে। ভারতবর্ষে আর্যরা বসতি করবার আগে প্রকৃত পক্ষে লোহার ব্যবহার শুরু হয় নি।

লোহার মত মজবুত, শক্ত ধাতুর ব্যবহার মানুষের খাদ্য-উৎপাদন-পদ্ধতিতে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন, যাকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। লোহার তৈরি লাঙ্গলের ফলা যখন

মাটিতে বিঁধিয়ে চাষ শুরু হ'ল, তখন ফসল ফলানো হ'ল আগের চেয়ে অনেক সহজ। খাদ্যশস্যের সম্পদ যত বাড়ল, মানুষের সুখ আর সমৃদ্ধি ততই বাড়তে লাগল।

(খ) **সামাজিক ও আর্থিক জীবনে পরিবর্তন :** লোহার ব্যবহার যখন থেকে সহজ হ'য়ে উঠল এবং ধাতু-হিসাবে লোহা হ'ল সুলভ, তখন থেকে সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহের উপায় খুঁজে পেল। কৃষকের হাতের লাঙ্গল, কামারের হাতের হাতুড়ি আর আত্মরক্ষার জন্যে ইস্পাতের তৈরি অস্ত্র মানুষকে দিল আত্মবিশ্বাস। রাজা, দেবতা আর অভিজাতদের দয়া ভিক্ষা ক'রে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন রইল না। যোগাযোগ-ব্যবস্থা আগের চেয়ে সহজ হ'ল। কাঠের চাকার বদলে এবার লোহার চাকা লাগল গাড়ীতে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য,—মানুষ সব দিক থেকেই অনেক উন্নত পর্যায়ে উপস্থিত হ'ল।

লোহা-ব্যবহারের যুগে সমাজের কয়েকটি লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। যেমন, লেখা-পড়ার উন্নতি। চিত্র-লিপির বদলে এই যুগে হরফ বা অক্ষর আবিষ্কার হ'ল। পশ্চিম এশিয়ায় ফিনিসীয় জাতি প্রথম অক্ষর দিয়ে কথা লেখার পদ্ধতি বার করেছিল। এই যুগের আর একটি বিশেষ পরিচয়, মুদ্রার ব্যবহার। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম-হিসাবে টাকাপয়সার প্রয়োজন এতদিন মানুষ ততটা বুঝতে পারে নি। লিডিয়াতে প্রথম সোনারূপা-মেশানো ধাতু ইলেকট্রনের মুদ্রা প্রচলিত হয়। পরে গ্রীসে ও পারস্যে রূপা ও সোনার মুদ্রা চালু হয়।

(গ) **রাজার শক্তিবৃদ্ধি :** ব্রোঞ্জযুগে রাজা ছিলেন দেবতার মতই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। লৌহযুগে রাজার শক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। কারণ, লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত শক্তিশালী সেনাবাহিনী যে-রাজার হাতে, সে-ই রাজা তো শক্তিশালী হবেনই। তা'ছাড়া লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষকের ফসল ফলানো যে হারে বেড়ে চলল, তাতে রাজকোষে কর

আসতে লাগল আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে। এর ফলে রাজার ক্ষমতা ও সম্পদও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন ও মিশরের রাজারা এই যুগে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু লৌহযুগে সব রাজারই যে শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, একথা বলা চলে না। পারস্যের সম্রাট খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'ক্ষত্রপ'দের ওপর নির্ভরশীল, যেমন চীনে চাঙ্ বংশের রাজা ছিলেন সামন্তদের নায়কমাত্র।

৫·১ (১)। ব্যাবিলন

(ক) **কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য :** ইউফ্রেটিস নদীর জল চাষের কাজে লাগিয়ে ব্যাবিলনের অধিবাসী সুমের জাতি প্রচুর ফসল ফলাত। বিশেষ ক'রে যব ও গমের চাষ তারা করত। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে ছিল ভেড়া আর ছাগল। ষাঁড় দিয়ে লাঙ্গল টানানো হ'ত। গাধার কাজ ছিল চাকা লাগানো রথ ও শকট টেনে নিয়ে যাওয়া। ঘোড়া তখনও ছিল অজানা। নীলনদের উপত্যকা থেকে নিয়ে আসা হ'ত তামা। তাই দিয়ে কামার তৈরি করত বাসন-কোসন। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করবার উপায় তখনও জানা যায় নি। কিছুকাল পরে অবশ্য ব্রোঞ্জের ব্যবহার শিখেছিল সুমেরীয়রা, এমন কি লোহা-ব্যবহারের খবরও তারা জেনেছিল।

ব্যাবিলনের চামড়া ও পশমের কাজ সমস্ত পশ্চিমের এশিয়ায় খুব সমাদর পেত। ভারতের সঙ্গেও ব্যাবিলনের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ বেলুচিস্তানের সঙ্গে খুব সম্ভব সমুদ্রপথে ব্যবসা চলত। স্থলপথে গাধায় টানা গাড়ীতে ক'রে জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি হ'ত। রোদে শুকিয়ে নেওয়া মাটির সীল-মোহর বাণিজ্যের কাজে খুব লাগত। এই সব সীল-মোহরের গায়ে লেখা থাকত সেই বণিকের নাম, যিনি কোন জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতেন। মুদ্রার ব্যবহার

তখনও জানা ছিল না। খানিকটা রূপা ওজন ক'রে দিয়ে জিনিস-পত্র বেচাকেনা হ'ত। রূপার ওজনকে বলা হ'ত 'শেকেল'। ব্যাবিলনের নাগরিক সভ্যতায় বণিকরা ছিল শক্তিশালী শ্রেণী। সেখানকার মন্দিরগুলি ছিল ব্যবসার কেন্দ্র। মন্দিরে অনেক সম্পদ থাকত। সেখান থেকে ব্যাঙ্কের মত ধার দেওয়া হ'ত, আবার পণ্যদ্রব্য বেচাকেনারও ব্যবস্থা হ'ত।

(খ) **মন্দির ও যাজক**ঃ টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর মাঝের এলাকাটি 'সিনার সমতল' বলে পরিচিত ছিল। সিনারের প্রায় মাঝখানটিতে ছিল নিপ্‌পুর নামে একটি নগর, ব্যাবিলনের ধর্মকেন্দ্র। এখানে ছিল বাতাসের দেবতা 'এনলিলের' নামে এক বিরাট উঁচু মন্দিরচূড়া। চতুর্ভুজাকার এই চূড়া ভিত থেকে শিখরের শেষ



ব্যাবিলনের মন্দির

পর্যন্ত ক্রমশ আকৃতিতে ছোট হ'য়ে আসতে থাকে, ফলে অনেকটা পিরামিডের মত দেখায়। আগাগোড়া বাঙলা 'পীঢ়' দেউলের মত দেখতে এই চূড়াটি আসলে মন্দির নয়, দেবতার মন্দির থাকত শিখরের একেবারে শীর্ষে। ঘোরানো পথ দিয়ে চূড়ার গা বেয়ে বেয়ে ভক্তরা উঠতেন সেখানে। মন্দিরের এই পাহাড়ের মত উঁচু চূড়াকে বলা হ'ত 'জিগ্‌গুরাট', পরে এর নাম দেওয়া হয় 'টাওয়ার অব ব্যাবেল'। অমনি চূড়া আরও অনেক নগরে স্থাপিত হয়েছিল।

ব্যাবিলনের বাড়ী-ঘর-মন্দির ইত্যাদি তৈরি করতে পাথরের ব্যবহার ছিল না। রোদে শুকোনো মাটির ইঁট দিয়ে তৈরি হ'ত এই সব। যাই হোক, উঁচু চূড়ার পাশেই থাকত ছোট একটি মন্দির, সেখানে দেবতার মূর্তি থাকত। মন্দিরের সংলগ্ন ছিল উঠান। মন্দিরের চারদিকে গড়ে উঠত নানা ধরনের বাড়ী, যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখবার ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে দপ্তর, পুরোহিত এবং তাঁদের সাহায্যকারী সেবাইতদের থাকবার ঘর ইত্যাদি। বহু একর জমি জুড়ে এই তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত।

বিরাট এলাকাটি একটি ছোটখাট শহরের মত ছিল। এখানে শাসক ছিলেন পুরোহিত-শ্রেণী। তাঁরা খুব সমৃদ্ধ ছিলেন। এক শ্রেণীর করণিক বা কেরাণী তাঁদের সাহায্য করতেন মন্দিরের অধীনে যে সব জমি-সম্পত্তি ছিল, তা' দেখা-শোনার কাজে। মন্দির-নগরীর যিনি রাজা ছিলেন, তিনিও একজন পুরোহিত। তিনি 'পতেসি' নামে পরিচিত ছিলেন। যে রাজা রাজত্ব ও দেশ-শাসন করতেন, তাঁর সঙ্গে পুরোহিত-রাজার কোনও তফাৎ ছিল না।

(গ) **শিক্ষা ও সংস্কৃতি:** বাণিজ্যে ও সরকারী কাজে লেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মন্দিরের পুরোহিতরা তাঁদের লিপিকারদের দ্বারা হিসাব রাখতেন। ব্যাবিলনের অনেক লিখিত মাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম যুগে চিত্রলিপির ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী কালে 'কিউনিফর্ম' লিপি বা ত্রিভুজাকৃতি (বাণমুখী) চিহ্নের সাহায্যে লেখার পদ্ধতি দেখা যায়। নরম মাটির ফলকে খড়কাঠি দিয়ে লিখে ফলকটি হয় রোদে, না হয় আগুনের তাপে শুকিয়ে মজবুত এবং স্থায়ী করা হ'ত। সেকালে ফলকে লিখতে শেখানোর জন্যে বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষকদের কাছে রীতিমত তালিম নিতে হ'ত।

'কিউনিফর্ম' লিপিকে বেশীর ভাগ ফলকই আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে লেখা। তবে সে যুগে সাহিত্যসৃষ্টিও হয়েছিল।

'গিলগামেস' নামে মহাকাব্য, সৃষ্টির মহাকাব্য, প্রবাদ, সুভাষিত ও সংলাপে গভীর জ্ঞানের কথা ব্যাবিলনীয় সাহিত্যের নমুনা। সুমেরীয় ছিল সাহিত্য ও ধর্মের ভাষা।

চন্দ্রের গতি দেখে সময়ের পরিমাপ করা হ'ত ব্যাবিলনে। প্রতি অমাবস্যায় নূতন মাসের শুরু হ'ত। এই রকম বার মাসে এক বছর হ'ত। সংখ্যা গণনা করা হ'ত এক ষাট, দু' ষাট, তিন ষাট ক'রে ষাটের ভিত্তিতে। জিনিসপত্র ওজনের বেলায় 'শেকেল' ছিল সব চেয়ে কম একক। এইরকম ষাট শেকেলে এক 'মীনা' হ'ত।



নক্সাকাটা মাটির পাত্র
(উরের খননকার্যে প্রাপ্ত)

বিজ্ঞানের নানা শাখায় ব্যাবিলন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। বীজগণিত ও জ্যামিতির পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি দেখে রাজা ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া হ'ত। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে কিনা তাও জ্যোতির্বিদ্‌রা বলে দিতেন। চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। নিনেভে শহরে অসুরবানিপলের গ্রন্থাগারে রক্ষিত মাটির ফলকে লেখা 'কিউনিফর্‌ম' থেকে এসব খবর, বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিবিধানের কথা জানা যায়। বিচিত্র রঙ, সাবান ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে যে রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োজন, তা ব্যাবিলনীয়রা জানত।



খোদাই-করা
যোদ্ধার ছবি

শিল্পকলাতে ব্যাবিলন অগ্রসর ছিল। কোনও শিল্পীর নাম জানা যায় না। বেশীর ভাগ শিল্প সৃষ্ট হ'য়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে আর প্রয়োজনটা ছিল বিশেষ করে ধর্মের। রাশি রাশি সীল পাওয়া গেছে। এই সব সীলের ওপর নানা দৃশ্য উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

সমতল ফলকে ওপরে রাজা, যোদ্ধা, দেবতার মূর্তি খোদাই করা হত। পাথরের বা ধাতুর তৈরি মসৃণ পাত্রের ওপর আঁকা



সোনার কারুকার্য-করা তরবারির খাপ

হ'ত নানা ধরনের ছবি। পাথর কেটে মানুষ ও পশুর চেহারা বের ক'রে আনতে পারত শিল্পীরা। হাতির দাঁতের ওপরে সোনার কাজ ছিল খুব সুন্দর।

(ঘ) **হামুরাবি কোড বা সংহিতা :** ব্যাবিলনে সমাজ ও সভ্যতা অগ্রসর হয়েছিল অনেকখানি। এর পেছনে কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে, সমাজে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় ছিল। হামুরাবি নামে এক রাজা ছিলেন। সাধারণ মানুষ, অনাথ, গরীব, বিধবা—সকলেই যাতে সুবিচার পেতে পারে, তার জন্যে তিনি কতকগুলি আইন করেন। আইনগুলি হামুরাবির নামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে 'হামুরাবি কোড' বা 'সংহিতা' নামে পরিচিত। এই 'কোড' সেমিটিক ভাষায় একখণ্ড পাথরের ফলকের ওপর উৎকীর্ণ করা হয়। ফলকটিতে দেখা যায়, হামুরাবি সূর্যদেবতা শামাশের কাছ থেকে আইনবিধি গ্রহণ করছেন। সাতফুট ছ'ইঞ্চি উঁচু এই পাথরখানি ব্যাবিলনের দেবতা মর্‌দুকের মন্দিরে রাখা হয়েছিল।



তীরবিদ্ধ মুমূর্ষু সিংহীর ছবি

হামুরাবি তাঁর অভিজ্ঞতা ও আগেকার প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে ভিত্তি করে আইন রচনা করেন। আইন-বিধি বা 'কোড' দু'শো ষাটটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। যে-সব বিষয়ে আইন করা হ'য়েছে

—তার মধ্যে রয়েছে বিচার-পদ্ধতি, সম্পত্তি, জমি ওবসত বাড়ী, বণিকশ্রেণী, স্ত্রীলোক, বিবাহ, পরিবারের সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, ব্যক্তিগত দৈহিক আক্রমণ, বিভিন্ন পেশার মানুষের পারিশ্রমিক, কৃষি, খাজনার নির্দিষ্ট হার, ক্রীতদাস—এই সব। পরবর্তীকালে ইহুদিরা হামুরাবির আইন-বিধি অনুসরণ করেছিলেন। হামুরাবির উদ্দেশ্য ছিল, গরীব চাষী, কারিগর, স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস প্রভৃতিকে বঞ্চনা আর শোষণ থেকে মুক্ত করা। কারণ, সমাজের যাঁরা ওপরতলার মানুষ, যেমন ভূমির মালিক, বণিক, পুরোহিত ইত্যাদি তাঁরা নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্যে—সাধারণ মানুষকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতেন। এছাড়া, দোষী ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর।


হামুরাবি-সংহিতার প্রস্তর-ফলক

হামুরাবি যে-সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল খেটে-খাওয়া মানুষের সমাজ। নগরেই ছিল সমাজের কেন্দ্র। নগরকে ঘিরে থাকত মাইলের পর মাইল চাষের জমি আর গ্রাম। নাগরিকদের মধ্যে এক শ্রেণী ছিলেন জমির মালিক। তাঁরা ক্রীতদাস দিয়ে জমি চাষ করাতেন; অন্যদিকে জলপথে ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এই সব জমির মালিকরা ছিলেন মধ্যবিত্ত। এঁদের ওপরে স্থান যাঁদের, তাঁরা রাজকর্মচারী, পুরোহিত আর নগরের অভিজাতরা। এঁদের অধিকারে থাকত বিরাট পরিমাণ জমি। এঁদের নিয়েই গড়ে উঠত নগর-রাজ্য। নগর-রাজ্যের রাজা ছিলেন 'এনসি'। যাঁর অধিকার একটি নগর-রাজ্যকে অতিক্রম ক'রে আরও বিস্তৃত ছিল, তাঁকে বলা হ'ত 'লুগল' অর্থাৎ মহান্ পুরুষ। সমাজে সকল শ্রেণীর নীচে ক্রীতদাস ছাড়াও ছিল স্বাধীন শ্রমিক, কৃষক, পশুপালক, জেলে, ইট-কাঠের মিস্ত্রি, কামার, কুমোর, তাঁতি, স্বর্ণকার প্রভৃতি।

৫'১ (২)। সাম্রাজ্যবাদী মিশর

(ক) **মিশরীয়দের রাজ্যবিস্তার :** আরবদেশের হিক্‌সস নামে এক পশুপালক জাতি কিছুকালের জন্যে মিশর অধিকার করে। তারা মিশরে ঘোড়ার প্রচলন করে।

হিকসসী রাজত্বের পর মিশরে ফ্যারাওদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের যুগে (খৃঃ পূঃ ১৫৮০—১১৫০ অঃ) মিশর ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠে এবং নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সেইজন্য এই বংশের রাজত্বকালকে 'সাম্রাজ্যের যুগ' বলা হয়।

ফ্যারাও প্রথম থাটমোজ সিরিয়া জয় করেছিলেন। ফ্যারাও তৃতীয় থাটমোজ সিরিয়ার একটি বিদ্রোহ দমন করে পশ্চিম এশিয়ার আরও কিছু রাজ্য জয় করেন। তিনি সিরিয়া থেকে অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই ধনরত্নে তিনি একটি বিশাল নৌবাহিনী গঠন করেন। তাঁর সময়ে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে মিশরের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তৃতীয় থাটমোজ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, মিশরের 'নেপোলিয়ন' এবং মিশরীয় দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজধানী ছিল থিবিসে। তার পর ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপ-এর আমলে মিশরের সাম্রাজ্য ইউফ্রেটিসের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। চতুর্থ আমেনহোটেপ (ইখনাটন)-এর আমলে অমরনা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে ফ্যারাওর সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে সিরিয়া হিট্টাইট জাতির দ্বারা অধিকৃত হয় এবং দক্ষিণ দিকে প্যালেস্টাইন ইহুদি জাতির অধিকারে চলে যায়। এইভাবে সাম্রাজ্যের যুগের অবসান ঘনিয়ে আসে।

(খ) **পুরোহিতদের ক্ষমতা :** সভ্যতার শুরু থেকেই মন্দির গড়ে ওঠে বিভিন্ন জায়গায়। নগর গড়ে ওঠার পর মন্দির ও

প্রাসাদ গড়ে ওঠে—কোথাও পাশাপাশি, কোথাও বা দূরে দূরে। কিন্তু মন্দিরের চূড়া সর্বক্ষেত্রেই প্রায় রাজপ্রাসাদকে ছাড়িয়ে উঠত। এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন পুরোহিতরা। পুরোহিতদের প্রধান কাজ ছিল দেবতার পূজা করা ও তাঁকে কিছু উৎসর্গ করা। পুরোহিতরা যাদুবিদ্যা জানতেন এবং অসুখ হলে ঔষধপত্র দিতেন। তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যাও জানতেন। তাঁদের হাতেই ছিল মিশরের ছেলেদের শিক্ষার ভার। পাঠশালা বসত মন্দিরের একপাশে। একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্তা।

ফ্যারাও-রা পুরোহিতদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে মনে করতেন। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে জানতেন। ফলে, পুরোহিতদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ লেগেই থাকত।

৫·১ (৩)। ইরান বা পারস্য

(ক) **পারস্যের উত্থান ঃ** খৃস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে এশিয়ার পতনের পর মিডিয় নামে আর্য জাতির একশাখা টাইগ্রিস নদীর পূর্বদিকে পার্বত্য অঞ্চলে ইরানীয় সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। কিছুকাল পরে পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের পারসিক নামে আর্যজাতির অপর শাখা সাইরাসের নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মিডিয়দের প্রভুত্ব অস্বীকার করে। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাইরাস এশিয়া মাইনরের লিডিয়া রাজ্য এবং ব্যাবিলন জয় ক'রে পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্যামবাইসিস মিশর জয় করেন এবং ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে ভারতে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত সমগ্র সভ্য প্রাচ্য ভূখণ্ড পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী পারস্যের সম্রাট ডেরিয়াস (১ম) এবং জারেক্সেসের রাজত্বকালে পারসিকরা এশিয়ার বৃহত্তম নৌশক্তিতে পরিণত হয় এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রভুত্ব করে।

(ক) **জরথুষ্ট্রের ধর্ম :** প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের সঙ্গে বৈদিক আর্য ধর্মের অনেক মিল ছিল। ইরানীয়রা 'মিথ্র' (মিত্র বা সূর্য), 'অনীয়তা' (পৃথিবী) এবং 'হাওম্' নামে দেবতার পূজা করত। প্রাকৃতিক দেব-দেবীর উপাসনাই ছিল তাদের ধর্ম। যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের উপাসনা করা হ'ত।

খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে জরথুষ্ট্র প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের সংস্কার করেন। তিনি দেবদেবীর পূজা এবং পুরোহিতদের জটিল যাগ-যজ্ঞ পছন্দ করতেন না। তিনি প্রচার করলেন যে, সৃষ্টির মধ্যে দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে—পুণ্যশক্তি 'আহুর-মাজদা' এবং পাপশক্তি 'অহ্রীমান' বা 'অহ্রীন'। আহুর-মাজদা হলেন আকাশব্যাপী জ্যোর্তিময় পুরুষ—তিনি আলো, সত্য এবং নিত্য নিয়মের দেবতা—বৈদিক ইন্দ্রের মত অসুরমর্দন। আর অহ্রীমান হলেন অন্ধকার, গোপনতা, কূটনীতি ও শঠতার প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের অন্তরেও এই দু' শক্তির সংগ্রাম চলেছে ; পাপকে পরাস্ত করে মানুষকে পুণ্যের আশ্রয় নিতে হবে। জরথুষ্ট্রের ধর্মমত 'জেন্দ-আবেস্তা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। এটিই পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ। জরথুষ্ট্র ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা বা মূর্তিপূজা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পারসিকগণ বেদি রচনা করে অগ্নির উপাসনা করত। অগ্নি বা 'আথস্' তাদের কাছে কিন্তু আহুর-মাজদার পুণ্য জ্যোতিঃ। জ্যোতির্ময় সূর্য বা মিথ্র (মিত্র) ছিল তাদের উপাস্য। প্রত্যেক বাড়ীতে অগ্নিবেদি থাকত। বেদির আগুনকে কখনও নিভতে দেওয়া হ'ত না।



পারসিকদের অগ্নিবেদি

৫.১ (৪)। ইহুদি জাতি

(ক) **ইহুদিদের মিশরে আগমন:** আর্যরা পশ্চিম-এশিয়ায় আসবার আগে যারা সেখানে বাস করত, তারা সাধারণতঃ সেমেটিক জাতি নামে পরিচিত ছিল। কারণ, তাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল সেম। সেমেটিক জাতির এক শাখার নাম ইহুদি।

এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইহুদিরা বাস করত জুডিয়া দেশে। তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আব্রাহাম নামে এক মেষপালক। তিনি মেসোপটেমিয়ার 'উর' নগরের উপকণ্ঠে বাস করতেন। সেখান থেকে নূতন তৃণভূমির খোঁজে সদলবলে মিশরের উত্তর-পূর্ব কোণে গশেন প্রদেশে উপস্থিত হন। তিনি প্যালেস্টাইনের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় প্যালেস্টাইনের নাম ছিল 'কানান' অর্থাৎ 'প্রতিশ্রুত দেশ'। আব্রাহাম অন্তরে অনুভব করেন, তাঁর ভগবান 'যিহোভা' তাঁকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিকে এই প্রদেশটি দান করেছেন।

আব্রাহামের সন্তান-সন্ততিরা মিশরের প্রান্তে গশেন প্রদেশে বাস করত এবং যাযাবরের জীবন যাপন করত। তারা নানা জায়গায় বসতি বদল করে সরল ভাবে জীবন কাটাত। তাদের পারিবারিক জীবন ছিল পিতার শাসনাধীন। আরব মরুভূমির হিক্‌সস্ নামে এক পশুপালক জাতি মিশর আক্রমণ ক'রে নীলনদের উপত্যকায় পাঁচশো বছর আধিপত্য করেছিল। ইহুদিরা ফ্যারাওদের বিরুদ্ধে হিক্‌সস্‌দের বিশেষ সাহায্য করেছিল। খৃঃ পূঃ ১৭০০ অব্দে মিশরীয়রা হিক্‌সস্‌দের বিতাড়িত করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনে। এই সময় থেকে ইহুদিদের দুর্দিন শুরু হয় এবং ফ্যারাওদের অধীনে তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। মিশরের ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেশিস তাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন শুরু করেন। গশেনের পথ-ঘাট তৈরি করার এবং ইট তৈরি করার কাজে তাদের জোর করে লাগানো হতে থাকে।

(খ) **মোজেস-এর নেতৃত্বে ইহুদিদের মিশরত্যাগ :** ফ্যারাওয়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মোজেস নামে একজন নেতার নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইহুদিরা মিশর ত্যাগ করল। দক্ষিণের মরুভূমির পথে এসে তারা লোহিত সাগর পার হয়ে সিনাই উপদ্বীপে পৌঁছাল। শেষে তারা উপস্থিত হ'ল প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ সীমান্তে কাদেশ নামে এক মরুপ্রায় অঞ্চলে। এখানে চল্লিশ বছর তাদের পশুচারণ করে কাটে। এরপর ইহুদিরা ধীরে ধীরে সমস্ত কানান দখল করে ফেলে। বিজিত কানানের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ইহুদিদের সঙ্গে মিশে যায়। জেরুসালেম হয় ইহুদিদের রাজধানী।

মোজেস-বিধি : মোজেস ইহুদি জাতির প্রথম নবী বা পয়গম্বর। তিনি সিনাই পর্বত থেকে যিহোভার প্রত্যাদেশ বলে বর্ণিত দশটি বিধি ঘোষণা করেন। সেই বিধিগুলির দ্বারাই তিনি ইহুদিদের জীবনযাত্রা আইনকানুনে বেঁধে দেন। এগুলিই হ'ল ইহুদিদের জাতীয় ধর্মবিধি এবং সমাজ-শাসনের মূল মন্ত্র।

বিধিগুলি এই রকম :

সপ্তাহে ছ'দিন কাজ ও একদিন বিশ্রাম করবে ; মাতাপিতাকে ভক্তি করবে ; কাউকে হত্যা করবে না ; চরিত্র বিশুদ্ধ রাখবে ; চুরি করবে না ; প্রতিবেশীর জিনিসে লোভ করবে না ; মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না ; ঈশ্বর এক ; দ্বিতীয় কোন দেবতা নেই ; মূর্তিপূজা করবে না ; বৃথা ঈশ্বরের নাম নেবে না।

এই সকল বিধি থেকে মনে হয় যে, ইহুদিরা তখনও আদিম সমাজে বাস করছিল, এবং সংস্কৃতিতে যথেষ্ট অগ্রসর হয়নি।

৫'২। গ্রীস

(ক) গ্রীসের সভ্যতায় ক্রীটের প্রভাবঃ খৃস্টের জন্মের আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম-এশিয়া মাইনরের কয়েকটি স্থানে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার নাম 'ঈজিয়ান সভ্যতা'। এই সভ্যতা পরবর্তী কালে গ্রীক সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল। ঈজিয়ান সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল ক্রীট দ্বীপে। ক্রীটের অধিবাসীরা প্রস্তর যুগ অতিক্রম ক'রে ব্রোঞ্জ যুগে পদার্পণ করেছিল। তারা উন্নতধরনের মৃৎপাত্র এবং ব্রোঞ্জের নানা রকমের জিনিস তৈরি করত। প্রথমে ফিস্টাস ও পরে নোসাস নগরে ক্রীটের রাজধানী হয়েছিল। নোসাসে খনন চালিয়ে অতি উন্নত ধরনের প্রাচীন নগর-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ক্রীটবাসীরা প্রথম দিকে চিত্রলিপির সাহায্যে লিখতে পারত; পরে তারা এক উন্নত ধরনের অক্ষরের ব্যবহার শেখে। তারা প্রাকৃতিক দেবদেবীর উপাসনা করত।



মহাকবি হোমার

এই সকল দেবদেবীর প্রধান ছিলেন 'রিয়া'। গ্রীকজাতি গ্রীস দখল ক'রে ঈজিয়ান সাগরের ক্রীট ও অন্যান্য দ্বীপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ঈজিয়ানসভ্যতার সংস্পর্শে আসে। গ্রীক সভ্যতা ঈজিয়ান সভ্যতার আদর্শে গড়ে ওঠে।

(খ) হোমারের যুগঃ প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমার 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' নামে দু'খানি মহাকাব্য রচনা করেন। এই

দুটি মহাকাব্যে যে-যুগের রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে 'হোমারের যুগ' বলা হয়। এই যুগে গ্রীক বীর ইউলিসিস বা ওডেসিয়াস, একিলিস, এগামেম্‌নন, ইনিয়াস প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছিল, এইজন্য একে 'বীরের যুগ'ও বলা হয়।

গ্রীকদেশ সে-যুগে রাজার শাসন-অধীনে ছোট ছোট কতকগুলি নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক, বিচারপতি, পুরোহিত এবং সেনাপতি। এত ক্ষমতাশালী হয়েও, 'বুলি' বা অভিজাত-পরিষদ ও 'এগোরা' বা গণ-পরিষদের মতামত না নিয়ে রাজা কোনও কাজ করতেন না।

সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তা ছিলেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত একটি 'ফ্যাট্রা' বা ভ্রাতৃসঙ্ঘ। সমাজে চারটি শ্রেণী ছিল—অভিজাত, স্বাধীন জন-সাধারণ, ভূমিহীন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস। প্রধানতঃ অভিজাত গোষ্ঠীই জমির মালিকানা ভোগ করত। জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় ছিল পশুপালন। সম্পত্তির মূল্য 'গরু'র মাধ্যমে স্থির হ'ত।



এথেনা

সে-যুগে প্রাকৃতিক দেব-দেবীর উপাসনা করত গ্রীকরা। দেব-দেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'জিউস'। প্রত্যেক নগরের আলাদা দেবতা ছিলেন, যেমন এথেন্স নগরের 'এথেনা'। মানুষের ভাগ্যের ওপর দেবতাদের বিশেষ প্রভাব আছে, এ কথা গ্রীকরা বিশ্বাস করত।

(গ) **নগর-রাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও উপনিবেশ-স্থাপন :** গ্রীক দেশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট উপত্যকায় বিভক্ত ছিল। এই সব উপত্যকার এক একটি নগরকে কেন্দ্র ক'রে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থীবস প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্রের ছিল নিজ নিজ শাসন-ব্যবস্থা ও দেব-দেবী এবং নিজস্ব জীবন-

ধারণ-প্রণালী। নগর-রাষ্ট্রগুলির কোথাও ছিল গণতন্ত্র, কোথাও বা রাজতন্ত্র।

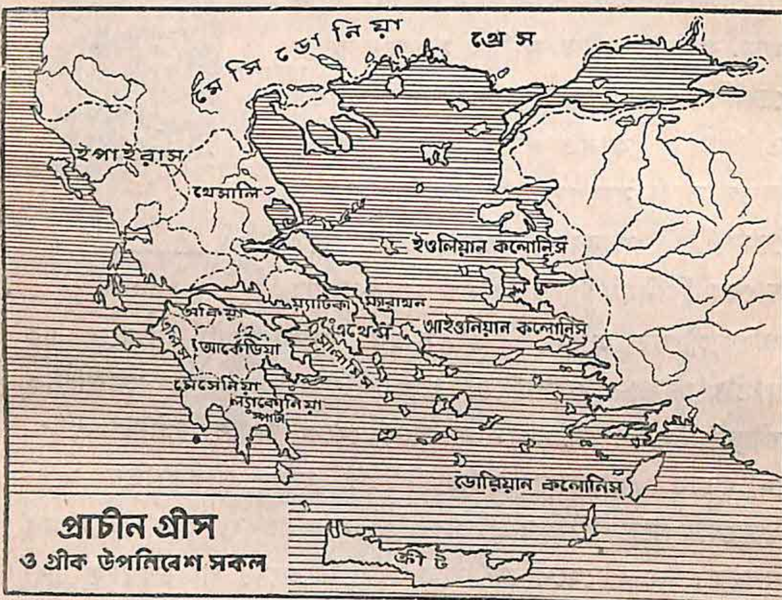
রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলেও, গ্রীক জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ছিল। তারা সকলেই গ্রীক ভাষায় কথা বলত। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'কে তারা জাতীয় মহাকাব্য বলে মনে করত। গ্রীক জাতির সকলের কাছে ডেলফির এপোলোর মন্দির ছিল পবিত্র তীর্থস্থান। কোনও শুভকাজ শুরু করবার আগে তারা সমবেত হ'ত ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শোনবার জন্যে। এই সূত্রে ভাবের বিনিময় হ'ত বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে। এলিস-এর 'অলিম্পিয়া' পাহাড়ে এক জাতীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হ'ত। একে বলা হ'ত 'অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান'। গ্রীসের নানা অংশ থেকে অসংখ্য লোক প্রতিযোগিতায় যোগদান করত। এর ফলে গ্রীকজাতির মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, তারা হেলেনের বংশধর। তাই 'হেলেনিজ' বলে তারা নিজেদের পরিচয় দিত এবং নিজেদের দেশকে বলত 'হেল্লাস'।


জিউস

ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ-স্থাপনের অনুকূল। গ্রীসের কোনও অংশই সমুদ্র থেকে চল্লিশ মাইলের বেশী দূরে ছিল না। সমুদ্র-উপকূলে গড়ে উঠেছিল বন্দর, যার মাধ্যমে বাণিজ্য চলত ঈজিয়ান সাগরে, এশিয়া মাইনর উপকূলে, সিসিলি, স্পেন, থ্রেস, ইটালি প্রভৃতি দেশে। বাণিজ্য করতে গিয়ে নানা স্থানে গ্রীকজাতি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। কারণ, গ্রীসের জমি ছিল অনুর্বর। ভাল ফসল হ'ত না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। জীবিকার সন্ধানে গ্রীক জাতির অনেক মানুষ দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে

সাগর পেরিয়ে বিদেশে নূতন বসতি গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মানুষেরা যখন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করত, তখন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠত বিশেষভাবে।

(ঘ) **এথেন্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনঃ** এথেন্স ছিল গণতন্ত্রের রাজ্য। অন্ততঃ একুশ বছর বয়স হলে প্রত্যেক স্বাধীন



প্রাচীন গ্রীস
ও গ্রীক উপনিবেশ সকল

এথেন্সবাসী পুরুষ একটি 'গণসভা'র সভ্য হতে পারত। দেশের সকল সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা হ'ত ঐ সভায়। তার ওপর পাঁচশো জনের একটি উচ্চতর সভার হাতে ছিল আইন-রচনার ভার। এটি আবার দশটি সমিতিতে ভাগ হয়ে কাজ করত। উচ্চ সভার সভাপতি হ'ত প্রতিদিন একজন নূতন লোক। প্রত্যেক সভ্য পালা করে নেতৃত্ব করবার সুযোগ পেত।

এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থার মূল আদর্শ ছিল স্বদেশপ্রেম ও সৌন্দর্যবোধ। লক্ষ্য ছিল, সুস্থ-সবল দেহ-বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমী নাগরিক গড়ে তোলা। ছেলেরা স্কুলে ভর্তি হ'ত সাধারণতঃ ছ' বছর

বয়সে এবং সেখানে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখত। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা আরও বেশী কয়েক বছর পড়ত।

শিক্ষার বিষয় ছিল লিখন-পঠন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম। প্রত্যেকেই বীণা বাজাতে শিখত। ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হ'ত সরকারী ব্যায়ামাগারে। কুস্তি, সাঁতার এবং ধনুর্বিদ্যা না শিখলে কোন পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ত না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখত বাড়ীতে। এথেন্সের মেয়েরা তাদের মা ও ধাত্রীর কাছে নৃত্যগীত এবং গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করত।


এথেন্সের সৈনিক

ষোল বছর বয়সে ছেলেদের ব্যায়াম-শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। কুস্তি, শিকার, রথচালনা, দৌড়, বর্শানিক্ষেপ প্রভৃতি অনুশীলন আরম্ভ হ'ত। আঠারো বছর বয়সে বালক হ'ত যুবক ; তখন আরম্ভ হ'ত যুদ্ধবিদ্যা ও নাগরিক কর্তব্যশিক্ষা। কয়েকজন নির্বাচিত নেতার হাতে এই শিক্ষাদানের ভার থাকত। এক রকম পোশাক পরে ও খাদ্য খেয়ে যুবকরা কঠোর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-শিবিরে থাকত। একবছর শিক্ষালাভের পর তারা নগর-রক্ষা বা সীমান্ত-রক্ষার কাজে নিযুক্ত হ'ত। তেইশ বছর বয়সে সামরিক ও পৌরশিক্ষা শেষ হলে তারা এথেন্সের নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা লাভ করত।

এথেন্সের নাগরিকরা অধিকাংশ সময় কাটাত ঘরের বাইরে—পথে বা বাজারের চৌমাথায়। সেইখানেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ত। জনমত-গঠনও হ'ত সেখানে। সন্ধ্যায় তারা যেত গণ-সভায় যোগদান করতে, সেখানে শাসনকার্য চালাত অথবা জুরি হয়ে বিচার-কার্যে সাহায্য করত তারা।

(ঙ) **স্পার্টার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ঃ** দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্টা ছিল একটি শক্তিশালী নগর-রাষ্ট্র। সেখানে একসঙ্গে

দু'জন রাজা শাসন করতেন; কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। একটি প্রবীণদের সভা আসলে শাসনকার্য পরিচালনা করত। একটি গণসভা আইনগুলো অনুমোদন করত, কিন্তু নূতন আইন রচনা করবার ক্ষমতা তার ছিল না। খৃস্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতাব্দীতে লাইকার্গাস স্পার্টার শাসনতন্ত্র রচনা করেন। তাঁর রচিত আইনগুলির সাহায্যেই স্পার্টার শক্তিশালী সমাজ গড়ে ওঠে। তাঁরই শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্পার্টান জাতি একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়।



স্পার্টান সৈনিক

সাত বছর বয়সে স্পার্টার বালককে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'ত। সরকার তার প্রতিপালনের ভার নিত। তাকে ভর্তি করা হ'ত একটি সরকারী শিক্ষাশিবিরে। এটি ছিল একাধারে সৈন্য-শিবির ও বিদ্যালয়। একজন বালক-পরিচালক এটি দেখাশোনা করত। প্রত্যেক শ্রেণীতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সাহসী বালক হ'ত এর নেতা। অন্য সকলে তার আদেশ মেনে চলত ও তার দেওয়া শাস্তি গ্রহণ করত। কর্মক্ষমতায় ও নিয়মানুবর্তিতায় প্রত্যেক বালক নেতার সমকক্ষ হবার বা তার চেয়ে যোগ্যতর হবার চেষ্টা করত। এই শিক্ষার ফলে প্রত্যেক বালক সামরিক সাহস ও যোগ্যতা অর্জন করত। প্রত্যেকেই অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে একটি কঠোর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষ হ'ত। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই তাকে খোলা জায়গায় শুতে হ'ত —শয্যার জন্যে পেত কেবল গাছের কতকগুলি শুকনো ডালপালা। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তুতির জন্যে শিক্ষার শেষের দিকে তাকে নিজের খাদ্য যোগাড় করতে শিখতে হ'ত। সেজন্য চুরিবিদ্যাও সমর্থন করা হ'ত; অবশ্য ধরা পড়লে মিলত বেত্রাঘাত। ত্রিশ বছর পর্যন্ত ব্যারাকের

মধ্যে এইভাবে স্পার্টার পুরুষদের জীবন কাটত, বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকত না। তারপর সে হ'ত পূর্ণাঙ্গ নাগরিক। কিন্তু ষাট বছর বয়স পর্যন্ত সে কোনরকম আরাম বা বিশ্রাম করতে পারত না। এই ভাবে স্পার্টানরা গ্রীসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

(চ) **এথেন্স বনাম স্পার্টা**ঃ এথেন্স ও স্পার্টা দুইটি ছিল গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র। এই দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা একই ভাষায় কথা বলত। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় ও আদর্শে তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই ছিল বেশি। এথেন্সবাসীরা খোলা মন নিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে মিশত, তারা অবসরসময়ে কাব্য-সাহিত্য, শিল্পকলার চর্চা করত আর এথেন্সের শিক্ষক-দার্শনিকদের আলোচনা শুনত। তাই এথেন্সে এসব বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। অন্যদিকে, কঠোর সামরিক শিক্ষাই ছিল স্পার্টানদের জীবনের আদর্শ। তারা কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির ধার ধারত না। কঠোর সামরিক শিক্ষার দ্বারা তারা নিজেদের তৈরি করেছিল সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে।

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গ্রীসের প্রভুত্ব নিয়ে অনবরত ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ লেগে থাকত, বিশেষ করে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে। এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে **পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধ** বিখ্যাত। খৃস্টপূর্ব ৪৩১ অব্দ থেকে ৪০৪ অব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। এই দুটি রাষ্ট্রের যুদ্ধে স্পার্টা এথেন্সকে ধ্বংস করেছিল সত্য, কিন্তু এথেন্সের জ্ঞান-চর্চা ও শিল্প-সাহিত্য-প্রীতি তারা কোনোভাবেই নষ্ট করতে পারেনি, বরঞ্চ পরবর্তী কালে এথেন্সের সংস্কৃতির সব কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

(ছ) **গ্রীসের সংস্কৃতিতে এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব**ঃ খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পেরিক্লিসের শাসনাধীনে এথেন্স সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে গ্রীসে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। এজন্য 'পেরিক্লিসের যুগ'কে গ্রীসের ইতিহাসে 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। পেরিক্লিস নিজে এক বক্তৃতায় এথেন্সকে **'গ্রীসের শিক্ষয়িত্রী'** আখ্যা দিয়েছিলেন।

পেরিক্লিসের নেতৃত্বঃ জেন্থিপ্পাসের পুত্র পেরিক্লিস গণতান্ত্রিক দলের নেতা ছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশবছর তিনি এথেন্সের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাসন-সংস্কারের দ্বারা সাধারণ মানুষকে অভিজাত শ্রেণীর সমপর্যায়ে নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন। তিনি এথেন্সকে কেন্দ্র করে বিশাল এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র গ্রীসকে রাজনৈতিক দিক থেকে একতাবদ্ধ করেন। তাঁর আমলে বহু উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। এথেন্সের পাইরিউস বন্দর একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।



পেরিক্লিস

ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগরের নানা দেশে বাণিজ্যের ফলে এথেন্সের যথেষ্ট সমৃদ্ধি হয়েছিল।



সফোক্লিস

সাহিত্যঃ এথেন্সে সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। **ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস** প্রভৃতি নাট্যকার এথেন্সের সাহিত্য-জগতে ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। তাঁদের নাটকগুলিকে বলা হয় 'ট্র্যাজেডি' বা বিয়োগান্ত নাটক। তাঁরা সমাজ-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে সমর্থন করেছেন। সফোক্লিস তাঁর নাটক লিখেছেন গ্রীসের সঙ্গে পারস্যের যুদ্ধের পটভূমিতে। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে একজন মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে দেবতা জিউসের দৃষ্টিপাতে। দেবতার বিধান যাই হোক না কেন, মানুষের কাছে দেবতা থাকবে চিরকাল সম্মানের আসনে—এই



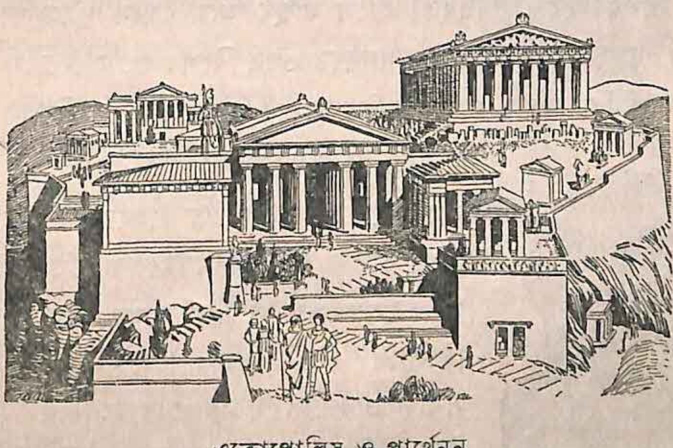
ইউরিপিডিস

কথাই সফোক্লিস বলতে চেয়েছেন। নাট্যশালার (থিয়েটারের) সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। পেরিক্লিসের জীবন-অবসানে তাঁর যুগ শেষ হয়ে যায়নি। এথেন্সে আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তী কালে কয়েকজন মনীষীর। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় **হেরোডোটাসের**। তিনিই প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। তিনি তাঁর ইতিহাসে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, দেবতাদের ইচ্ছায় পারস্যের আক্রমণ থেকে গ্রীক জাতিকে রক্ষা করেছিল এথেন্স। **থুকিদিদিস** নামে আর একজন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেলোপোনেসাসের যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর মতে ইতিহাসের ঘটনাগুলি দেবতাদের প্রভাবে ঘটে না, কার্য-কারণ পৃথিবীতেই খুঁজতে হয়।



হেরোডোটাস

শিল্পঃ এথেন্সের শিল্পে চরম উন্নতি ঘটিয়েছিলেন স্থাপত্যশিল্পী **ইকটিনাস** ও ভাস্কর **ফিডিয়াস**। **পারথেননে** এথেনা দেবীর খুব বড়


এক্রোপোলিস ও পার্থেনন

একটি মূর্তি তৈরী করেছিলেন ফিডিয়াস। এক্রোপোলিসে এথেনার মন্দির পেরিক্লিসের নিজের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল। দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি সৃষ্টিতেই শিল্পীদের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। এথেন্সের

নানা বর্ণে চিত্রিত পাত্রগুলি আজও পৃথিবীর বিস্ময়। পাত্রের গায়ে সারিবদ্ধ মানুষের শোভাযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রা এথেন্সের সেকালের জীবনকে প্রতিফলিত করে।

ধর্ম ঃ গ্রীক জাতির কোনও ধর্মগ্রন্থ ছিল না। মন্দিরে পুরোহিত থাকতেন অবশ্য। কিন্তু সমাজে 'পুরোহিত-শ্রেণী' নামে কোনও শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। কাজেই ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দেবার তেমন কেউ ছিল না। তবে ছোটবেলায় এথেনীয়রা মায়ের কোলে বসে হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'র গল্প শুনতে শুনতে জানতে পারত নানা দেব-দেবীর কথা—জিউস, হেরাক্লিস, পোসাইডন, এথেনা ইত্যাদি। দেব-দেবীর ছবি তারা আঁকা দেখত বড় বড় পাত্রের গায়ে। অল্পবয়স থেকেই তাদের ধারণা হ'ত যে, মানুষের মত দেখতে দেব-দেবীরা মানুষেরই প্রকৃতিবিশিষ্ট। কখনও কখনও মন্দিরে মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা-উপলক্ষ্যে পান-ভোজন চলত। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন এথেনা। তাঁর মন্দির ছিল পার্থেননে। মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করেন দেবতারা—এই বিশ্বাস ছিল প্রথম দিকে। পরবর্তী কালে মানুষ আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। তখন সে ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

দার্শনিক চিন্তা ঃ এথেন্সের চিন্তাজগতে আলোড়ন এনেছিলেন যে মনীষী, তিনি **সক্রেটিস**। তিনি খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে একজন দরিদ্র ভাস্করের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি নিজের প্রতিভাবলে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীর আসন লাভ করে-ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচার শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সত্যের সন্ধান। তাঁর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী আকর্ষণ করেছিল এথেন্সের যুবকদের। তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন প্লেটো, এলকিবিয়াডিস, জেনোফোন প্রভৃতি মনীষীরা। সক্রেটিসকে



সক্রেটিস

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল এথেন্স-সরকার। তিনি কোনও প্রতিবাদ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও করেননি। কারাগারে 'হেমলক' বিষ পান করে নির্দিষ্ট দিনে সক্রেটিস প্রাণ-ত্যাগ করেন।

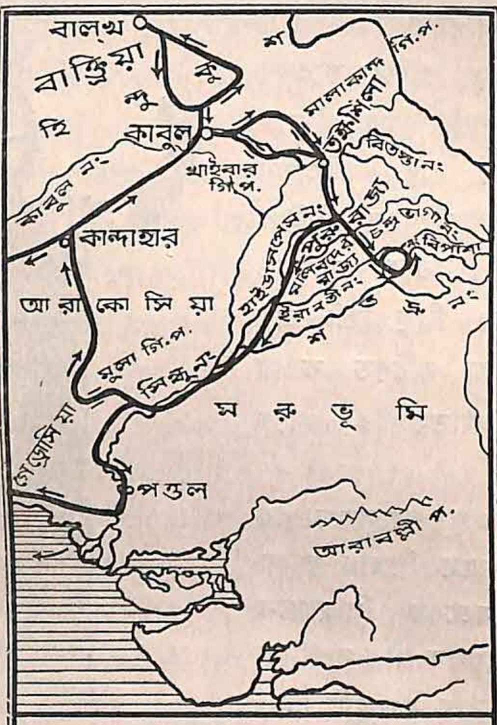
(ছ) **ম্যাসিডন — আলেকজাণ্ডার** ঃ গ্রীসের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল **ম্যাসিডন** নামে এক রাজ্য। গ্রীসের অন্যান্য নগর-রাষ্ট্র স্পার্টা, এথেন্স, থিবস প্রভৃতি দুর্বল হ'য়ে পড়লে, ম্যাসিডনের অধিপতি ফিলিপ সুযোগমত সমগ্র গ্রীসে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র স্পার্টা ভিন্ন গ্রীসের অপর সকল রাষ্ট্র ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফিলিপ পারস্য জয় করার সংকল্পও নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই সংকল্প কাজে পরিণত করার আগেই আততায়ীর হাতে নিহত হন।


আলেকজাণ্ডার

ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার বিশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর শিক্ষক ছিলেন। লিওনিডাস তাঁকে সামরিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। যাই হোক, সিংহাসনে বসেই আলেকজাণ্ডার গ্রীসের বিদ্রোহী দেশগুলিকে পদানত করেন এবং পিতার পারস্য-জয়ের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে উদ্যোগী হন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান ঃ খৃস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে আলেকজাণ্ডার এশিয়া মাইনরের পথে পারস্য-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন। পারস্য জয় করে তিনি মিশর জয় করেন। এর পর তিনি

ব্যাবিলন জয় করে তুর্কিস্তান দখল করেন। পরে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে নেমে আসেন আফগানিস্তানে। কাবুল নদীর উত্তরে কয়েকটি পার্বত্যজাতির সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়। তাদের বশে এনে খাইবার গিরিপথ দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। তারপর সিন্ধুনদ পার হ'য়ে তিনি তক্ষশীলার রাজা অম্ভির রাজ্যে



আলেকজান্ডারের আগমন ও প্রত্যাগমন পথ

পৌঁছোন। অম্ভি ইতিপূর্বেই এই দিগ্বিজয়ী বীরের কথা শুনেছিলেন। তিনি সহজেই গ্রীকদের অধীনতা মেনে নেন।

তখন সিন্ধু ও বিতস্তা (ঝিলাম) নদীর মাঝখানে ছিল অম্ভির রাজ্য আর বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মাঝখানে ছিল পুরু নামে একজন বীরের রাজ্য। পুরু বিদেশীর অধীনতা মানবার পাত্র ছিলেন না।

তিনি প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলেন। তাঁর সৈন্যদলে পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথের সঙ্গে ছিল দু'শ হাতী। গ্রীকরা একত্রে এতগুলি হাতী আর কখনও দেখেনি। তাই প্রথমে তারা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু গ্রীক তীরন্দাজদের আক্রমণে মাহুতগুলি মারা যাওয়ায় আহত হাতীর দল ক্ষেপে গেল। তাতে বিশৃঙ্খলা ঘটল এবং শেষ পর্যন্ত পুরু পরাজিত হলেন। আলেকজাণ্ডার অবশ্য পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

গঙ্গা-তীরের দেশগুলি জয় করবার ইচ্ছা নিয়ে আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীরে এসে পৌঁছোলেন, কিন্তু পূর্বদিকে তখন মগধরাজ্যে যে নন্দবংশীয় রাজা ছিলেন, গ্রীক সৈন্যরা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর কথা শুনেছিল। এছাড়া দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে তারা ক্লান্ত হয়েও পড়েছিল। তাই তারা আর এগোতে চাইল না। অগত্যা আলেকজাণ্ডারকে ফিরতে হ'ল। পথে তাঁকে আরও কয়েকটি যুদ্ধ করতে হয়। মালবদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি আহত হন। বালুচিস্তানের মরুভূমির পথে তিনি ব্যাবিলনে এসে পৌঁছান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দ)।

ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের পতন ঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সেলিউকাস ভার নেন পুরানো পারস্য সাম্রাজ্যের সিন্ধুতীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ; টলেমী দখল করেন মিশর এবং আন্তিগোনাস দখল করেন ম্যাসিডন। সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের জন্যে বিভিন্ন দাবিদার হাজির হন। উত্তর দিক হতে বর্বরদের আক্রমণ শুরু হয়।

রোমের গ্রাস-জয় ঃ আলেকজাণ্ডারের বংশধরেরা খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ম্যাসিডনে রাজত্ব করেন। অতঃপর ম্যাসিডন রোমের অধীনে একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাসিডন রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ এবং গ্রীসের অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রগুলি খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রোমের সামন্ত-রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫৩। রোম

(ক) **রোমের প্রতিষ্ঠা** ঃ কথিত আছে, রেমাস ও রমুলাস নামে দু'ভাই টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন।

আলবালঙ্গা রাজ্যের রাজা ছিলেন নামিটর। তাঁর ভাই এমুলিয়াস তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। নামিটরের দুটি শিশুপৌত্র ছিল, নাম রেমাস ও রমুলাস। দুটি শিশুকে নাকি ঝুড়িতে করে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ঝুড়িটি ভাসতে ভাসতে একটি গাছের নীচে এক গুহায় এসে লাগে। এক নেকড়ে বাঘিনী নিজের দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়েছিল। পরে এক মেষপালক তাদের প্রতিপালন করে। যখন দু'ভাই নিজেদের পরিচয় জানতে পারল, তখন তারা এমুলিয়াসকে তাড়িয়ে তাদের বুড়ো ঠাকুরদা নামিটরকে সিংহাসনে বসাল। তারপর তারা টাইবার নদীর তীরে ছোট ছোট সাতটি পাহাড়ে ঘেরা সমতল ক্ষেত্রে এক নূতন নগরী স্থাপন করল। সামান্য দোষে রমুলাস একদিন রেমাসকে হত্যা করে নিজেই রোমের রাজা হ'ল। রমুলাসের নাম-অনুযায়ী নূতন নগরীর নাম 'রোম' হয়েছিল।



বাঘিনী-মা

রোমের ষষ্ঠ রাজা ছিলেন সার্ভিয়াস টুলিয়াস। তাঁর সময়ে রোম বিস্তার লাভ করে। পরের রাজা টারকুইনাসের সময়ে সমস্ত ল্যাটিন দেশ (লেশিয়াম) রোমের অধিকারে চলে আসে। ক্রমশঃ ল্যাটিন, সেমনাইট, এট্রুস্কান, গল প্রভৃতি জাতি রোমের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই ভাবে সমস্ত ইটালীতে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(খ) **কার্থেজের সঙ্গে সংঘর্ষ** ঃ রোমকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র ইটালী-দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে সাম্রাজ্য-

বিস্তারে রোমানরা মনোযোগ দেয়। আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছিল কার্থেজ নগর। বহুদিন আগে ফিনিশিয়ানরা এই নগর-বন্দরটি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে কার্থেজকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ এবং সিসিলির অনেকখানি কার্থেজীয়দের অধিকারে আসে। স্পেনের এব্রো নদী পর্যন্ত তাদের উপনিবেশ ছিল।

রোমানরা যখন ভূমধ্যসাগরে তাদের আধিপত্য-বিস্তারে অগ্রসর হ'ল, তখন রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে উঠল অনিবার্য। এক'শো বছরেরও বেশী (খৃঃ পূঃ ২৬৪-১৪৬) স্পেনে, ইটালিতে ও আফ্রিকায় রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ **পিউনিক যুদ্ধ** নামে পরিচিত। **'প্রথম পিউনিক যুদ্ধ'** চলে সিসিলিতে প্রায় চব্বিশ বছর ধরে। যুদ্ধে কার্থেজীয়রা হেরে যায় এবং রোমানরা সিসিলি দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতি ছিলেন **বীর হামিলকার বার্কা**।


রোমান সৈনিক

সিসিলি হারিয়ে কার্থেজীয়রা স্পেনে উপনিবেশ গড়তে মন দিল। স্পেনে কার্থেজীয়রা এব্রো নদী পার হতে পারবে না, এই ছিল রোমের সঙ্গে চুক্তি। সে চুক্তি ভাঙ্গলে **'দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ'** শুরু হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতি ছিলেন হামিলকারের পুত্র বীর **হানিবাল**। প্রায় পনেরো বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষে তিনি রোমের কাছে পরাজিত হন। এই যুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগর থেকে কার্থেজের আধিপত্য লুপ্ত হ'ল। ভূমধ্যসাগরে রোমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ক্রমে রোমকে কেন্দ্রে ক'রে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই কারণে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ রোমের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা বলে পরিচিত। **তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের** সময়ে রোমানরা কার্থেজ নগর ভস্মীভূত করে দেয়।

(গ) **প্রাচীন রোম-সমাজ**ঃ প্রাচীন রোমের সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত। সুবিধাভোগী শ্রেণীর নাম ছিল **প্যাট্রিশিয়ান** এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর নাম ছিল প্লেবিয়ান।

রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান ছিল প্যাট্রিশিয়ানরা। প্লেবিয়ানরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। **কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটা** ও **সেনেট**—দুই প্রতিনিধি-সভাতেই প্যাট্রিশিয়ানরা ছিল প্রধান। দেশের আইন-কানুন প্লেবিয়ানদের কাছে অপ্রকাশিত ও অবিদিত ছিল। সেই সুযোগে প্যাট্রিশিয়ান বিচারকরা প্লেবিয়ানদের ওপর প্রায়ই অবিচার করত।


প্যাট্রিশিয়ান প্লেবিয়ান

প্লেবিয়ানদের জীবিকানির্বাহের উপায় ছিল কৃষিকাজ। কিন্তু জমির মালিকানা ছিল প্যাট্রিশিয়ানদের। দরিদ্র প্লেবিয়ানরা প্যাট্রিশিয়ানদের কাছে ঋণ ক'রে শোধ দিতে না পারায় অনেক সময় ক্রীতদাসে পরিণত হত।

প্লেবিয়ান ও প্যাট্রিশিয়ানদের মধ্যে বিবাহ অথবা বাণিজ্য-সম্পর্ক কখনও হ'ত না। প্লেবিয়ানরা জাতীয় ধর্ম-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না। উপাসনা-গৃহে তাদের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

(ঘ) **রোমের নাগরিকতা**ঃ প্লেবিয়ানরা রোমের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সব অধিকার থেকেই তারা বঞ্চিত ছিল। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতাও ছিল না। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৫০৯ থেকে খৃঃ পূঃ ৩৩৭ পর্যন্ত দীর্ঘকাল প্লেবিয়ানদের আন্দোলনের ফলে ক্রমে তারা মকদ্দমার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করবার অধিকার, ভূসম্পত্তির অধিকার, আদালতে বিচারকার্যে অংশগ্রহণের অধিকার, আইন-প্রণয়নের

অধিকার, সরকারী কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হবার অধিকার প্রভৃতি লাভ করল। সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা-নিষেধও আর থাকল না। প্লেবিয়ানরা রোমের নাগরিক অধিকার পেল দীর্ঘকালের সংগ্রামের ফলে।

(ঙ) **ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-বিদ্রোহ**ঃ পরবর্তীকালে রোমের সমাজে দুটি শ্রেণী দেখা যায়। অভিজাত শ্রেণী আর স্বাধীন কৃষক-বণিক-শিল্পী শ্রেণী। দেশের সমস্ত জমির মালিকানা এই সময় চলে গিয়েছিল অভিজাত শ্রেণীর হাতে। বিশাল ভূখণ্ডের মালিকরা মজুরি দিয়ে চাষবাস করানোর চেয়ে ক্রীতদাস-নিয়োগ অনেক বেশী লাভজনক মনে করলেন। শতবর্ষের পিউনিক যুদ্ধের ফলে হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী ক্রীতদাস হয়ে এসেছিল কার্থেজ, স্পেন, গ্রীস, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ থেকে। এই সব ক্রীতদাসকে কাজে লাগিয়ে জমির মালিক-শ্রেণী উৎপাদন বাড়ালেন এবং সম্পদ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। কেবল চাষবাস নয়, ক্রীতদাসরা খনির কাজ, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, জাহাজ-নির্মাণ প্রভৃতি কাজেও নিযুক্ত থাকত। গৃহভৃত্য, পাচক, কেরাণী প্রভৃতির কাজও তারা করত। অনেক ক্রীতদাস আবার শিক্ষিত ছিল, তারা গৃহশিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকেরও কাজ করত। রোমে যিনি যত বেশী ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন, তাঁকে তত ধনী বলে বিবেচনা করা হ'ত।



ক্রীতদাস

ক্রীতদাস-প্রথা রোমের সমাজের অর্থনীতিতে নিয়ে এল শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। ফলে ক্রীতদাসদের জীবনে দুঃখের অবধি ছিল না, প্রভুরা তাদের ওপর অবাধে অত্যাচার করত। অবশেষে নিপীড়িত ক্রীতদাস-শ্রেণী মুক্তির জন্যে আন্দোলন শুরু করে দিল। ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চলে ও সিসিলিতে ক্রীতদাস-বিদ্রোহ দেখা দিল। খৃস্টপূর্ব ৭৩ অব্দে থেসালীর **স্পার্টাকাস** নামে একজন গ্ল্যাডিয়েটর (মল্লবীর) এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত

সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাস্টের রচিত গ্রন্থে তাঁর বীরত্বকাহিনী অমর হয়ে আছে।

(চ) **জুলিয়াস সীজার**: রোমের এক অভিজাত পরিবারে জুলিয়াস সীজার জন্মগ্রহণ করেন খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দে। তাঁর শিক্ষা ও চরিত্র তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। সীজার রোমের নেতৃস্থানীয় পম্পে ও ক্রেসাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং সিনেট বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কনসাল-পদ লাভ করেন। রোমের সেনাদলের নায়ক হয়ে তিনি গল-দেশে গিয়েছিলেন। তিনি সমগ্র গল অধিকার করেন এবং সেখানকার শাসনকর্তা হন। এই সময় তিনি ব্রিটেন ও জার্মানী আক্রমণ করেন। তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দেখে তাঁর মিত্র পম্পে সিনেটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সীজারের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে মহামান্য বিজয়ীর বেশে সীজার রোমে ফিরে এলেন। তিনি স্পেন দেশটি পদানত করেন এবং গ্রীসে তাঁর বিরোধী পম্পেকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এরপর একচ্ছত্র সম্রাটের মত সমস্ত ক্ষমতা তিনি হাতে পেলেন। সিনেট তাঁকে রাজমুকুট দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তা' গ্রহণ করেননি। এরপর তিনি তাঁর ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে মন দিলেন—যুদ্ধ-ফেরত বেকার সৈনিক ও দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ-মোচনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তিনি চাইলেন নূতন সৌধ ও রাজপথ নির্মাণ করে রোমকে সুন্দর করে সাজাতে।



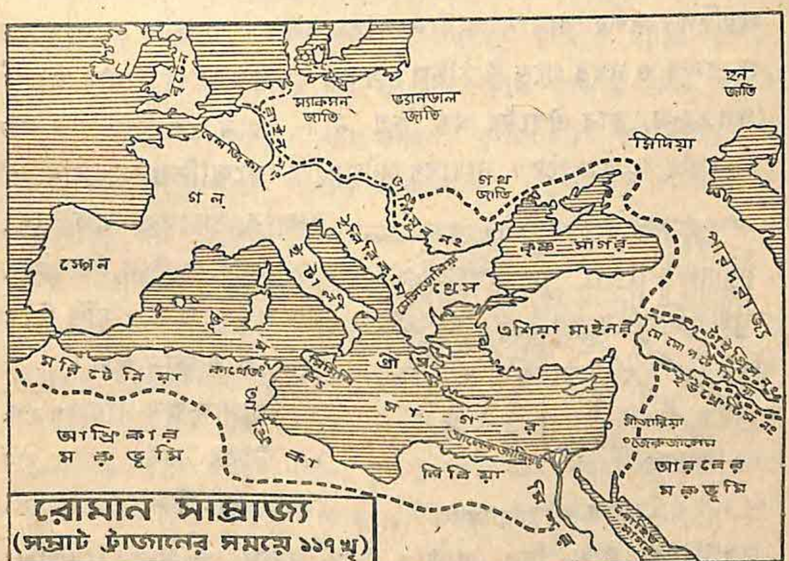
জুলিয়াস সীজার

(ছ) **রোমে গণতন্ত্রের অবসান**: সীজারের রাজত্বকালে রাষ্ট্রের সর্ব-ব্যাপারে তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে। সীজার রোমের প্রতিনিধি-সভা সিনেটের শক্তি কমিয়ে দেন এবং কেবলমাত্র

মন্ত্রণাকাজের ভার দেন সিনেটকে। তিনি নিজে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে প্রজাতন্ত্র ক্রমশঃ বিলুপ্ত হ'তে চলেছিল।

সীজারের একনায়কত্ব রোমের একদল লোক পছন্দ করল না। প্রজাতন্ত্রের অবসান হবে, এই আশঙ্কায় ষড়যন্ত্র করে খৃঃ পূঃ ৪৪ অব্দে সীজারকে সিনেট-সভায় তাঁরই বন্ধু ব্রুটাসের দ্বারা হত্যা করানোহয়।

(জ) **নূতন রোম সাম্রাজ্য ঃ** সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর দানপত্র-অনুযায়ী তাঁর ভাইয়ের ছেলে অক্টেভিয়াস তাঁর সম্পত্তির মালিক হবার কথা। তাই এণ্টনির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও অক্টেভিয়াস এক-নায়কত্ব লাভ করলেন। সিনেট তাঁকে **'প্রিন্‌সেপ্‌'** (রাজা) ও **'অগাস্টাস্'** (মহান্) উপাধি দান করল। তিনি হলেন রোমের সম্রাট অগাস্টাস্ সীজার। তিনি একাই সিনেট, ম্যাজিস্ট্রেট, পুরোহিত ও



রোমান সাম্রাজ্য
(সম্রাট ট্রাজানের সময়ে ১১৭ খৃ)

সেনাপতির ক্ষমতা পেলেন। অগাস্টাসের দৃঢ় শাসনে রোমসাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল। তিনি রোম নগরকে অসংখ্য

প্রাসাদ, মন্দির ও মূর্তি দিয়ে সুশোভিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল স্থায়ী হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ২৯ থেকে ১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

অগাস্টাসের পর টাইবেবিয়াস, ক্যালিগুলা, ক্লডিয়াস, নীরো প্রভৃতি সম্রাটেরা ৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন্। এই সময় এশিয়ায় চীন ও ভারতের সঙ্গে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এশিয়া মাইনরের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল রোম ও পার্থিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। ৯৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশো বছরকে **'এণ্টোনাইন-যুগ'** বলা হয়। এই যুগে ছ'জন সম্রাট রাজত্ব করেন—নার্ভা, ট্রাজান, হাড্রিয়ান, এণ্টোনিয়াস, মারকাস অরেলিয়াস ও কমোডাস।

অগাস্টাসের পর দু'শো বছরের মধ্যে রোম-সাম্রাজ্য একটি সংহত রূপ লাভ করে। সম্রাট ট্রাজানের সময় (খৃঃ ১১৭) এর আয়তন হয় সবচেয়ে বড়। এই বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল। সর্বত্র রোমান আইনে শাসন চলত। প্রত্যেক প্রদেশে বড় বড় বন্দর ও নগর গড়ে উঠেছিল। সকল নগরের মধ্যে রানীর আসন পেল রোম, তার ঐশ্বর্যের অন্ত ছিল না। রোম শোভিত হ'ল বড় বড় সৌধ ও প্রাসাদে। সাধারণ ক্রীড়াগার **'কলোসিয়াম'**, সাধারণ বাজার, সভাস্থল **'ফোরাম'**, বহু মন্দির, সার্কাস, থিয়েটার, বক্তৃতামঞ্চ, স্তম্ভ ও মূর্তি দিয়ে রোমকে সাজান হ'ল।



রোমের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ

রোমান জন-সাধারণ যে-সব উৎসব করত, সেগুলির কেন্দ্র-স্থল ছিল রোমনগর। অনুষ্ঠানের স্থান ছিল সার্কাস, স্টেডিয়াম ও থিয়েটারগুলি। **কলোসিয়াম** ছিল একটি বিশাল ক্রীড়া-প্রাঙ্গন। সেখানে যোদ্ধাদের মল্লক্রীড়া, মানুষ-পশুর লড়াই এবং পশুপ্রদর্শন হ'ত। রথ বা অশ্বের দৌড় হ'ত বড় বড় সার্কাসে। থিয়েটার-মঞ্চে ব্যায়াম দেখানোর

সঙ্গে গীতবাদ্য, অভিনয়, বক্তৃতা এবং আবৃত্তি চলত। মোট কথা, রোমানরা সর্বদাই আনন্দে উৎসবে মেতে থাকত।

কিন্তু রোমে ছিল ঐশ্বর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যের দৃশ্য। ধনীরা থাকত পাহাড়ের ওপর বড় বড় অট্টালিকায়; আর নীচের উপত্যকায় বাস করত গরীব জনসাধারণ, সামান্য কুটীরে ঠাসাঠাসি ভাবে তারা জীবন কাটাত।

(ঝ) **রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন ঃ** খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত দু'শো বছর ধরে সাম্রাজ্যের ক্রমশঃ অবনতি ও পতন ঘটে। বিশাল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলির ওপর কেন্দ্রের প্রাধান্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাষ্ট্রের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অভিজাত-শ্রেণী বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ আরও গরীব হয়ে পড়ছিল এবং রাষ্ট্রের ওপর আনুগত্য হারিয়ে ফেলছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে **গথ, ভাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক** প্রভৃতি বর্বর জাতি রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস করে। খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষে রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় বাইজানটিয়াম (পরে কন্‌স্টান্‌টিনোপল) আর পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম।

(ঞ) **খৃস্টধর্মের প্রবর্তন ঃ** অগাস্টাস সীজারের সময় খৃস্টধর্মের প্রবর্তক **যীশুখৃস্টের** আবির্ভাব হয়। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর **সেণ্ট পিটার** ও **সেণ্ট পল** রোমে প্রথম খৃস্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। রোম-সম্রাটদের মধ্যে নীরো ও ট্রাজান এই ধর্মের প্রচারে বাধা দিয়েছিলেন এবং হাড্রিয়ান ও এণ্টোনিয়াস এই ধর্মের প্রচারে সাহায্য করেন। ডাইওক্লেশিয়ান নামে রোমের সম্রাট খৃস্টানগণের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। কন্‌স্ট্যানস্টাইন (৩২৩-৩৫৩ খৃঃ) সর্বপ্রথন খৃস্টান ধর্মকে আইনতঃ স্বীকার করেন। কারণ, এই ধর্ম ধনী ও দরিদ্র সকলকে সমানভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

৫৪। চীন

(ক) **শ্যাং বংশঃ** আমরা আগেই চীনের পাঁচজন রাজার কথা আলোচনা করেছি। এই **পঞ্চরাজের** পরে চীনে **হুশিয়া** বংশ এবং



নক্সাকাটা ব্রোঞ্জপাত্র

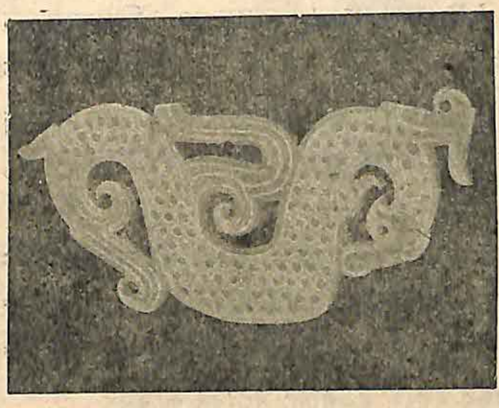
তারপর বিখ্যাত শ্যাং বংশ রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজত্বকাল ছিল প্রায় ছ'শো চুয়াল্লিশ বছর (খৃঃ পূঃ ১৭৬৬ থেকে খৃঃ পূঃ ১১২২ পর্যন্ত)। শ্যাংবংশের প্রতিষ্ঠা করেন **চেং ট্যাং**। ইনি ছিলেন একজন আদর্শ রাজা। প্রজাদের সৎকাজের মর্যাদা দিতেন তিনি, এমন কি নিজের অপরাধকেও ক্ষমা করতেন না। শ্যাং বংশের শেষ রাজা **চৌ-সিন** দুর্নীতি-পরায়ণ ও নৃশংস প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চৌ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা উ-ওয়াং।



ভূগর্ভে প্রাপ্ত বিচিত্র পাত্র

হোনান প্রদেশে সম্প্রতি শ্যাং রাজগণের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ ধ্বংসস্তূপ থেকে ভূগর্ভে সে-যুগের বহু জিনিস

পাওয়া গিয়েছে, যেমন, মানুষের হাড়, নক্সাকাটা মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জ পাত্র, তীরন্দাজ ও বর্শাধারী শিকারীর ছবি, ড্রাগনের ছবি প্রভৃতি। কতকগুলি যাদুমন্ত্র-লেখা কচ্ছপের খোলাও পাওয়া গিয়েছে। চীনের গণৎকারেরা এগুলির সাহায্যে নাকি লোকের ভবিষ্যৎ গণনা করতেন।



চীনের ড্রাগন

(খ) **কংফুশি :** চৌ-বংশের রাজত্বকালের দ্বিতীয় অংশে চীনে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন **কনফুশিয়াস** বা **কং-ফু-শি**। তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, ছিলেন একজন শিক্ষাগুরু। ৫৫১ খৃস্ট-পূর্বাব্দে কং-ফু-শি চীনের লু (বর্তমানে সানটাং) প্রদেশের চু-ফু নগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র তিন বছর পরেই তাঁর বাবা মারা যান। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক। শহরের পাঠশালায় লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংগীত ও ধনুর্বিদ্যা শেখেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে স্ত্রী মারা গেলে, তিনি আর বিবাহ করেন নি।



কং-ফু-শি

বাইশ বছর বয়সে তিনি নিজের বাড়ীতেই একটি বিদ্যালয়ে বালকদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাদের কাছ থেকে যা' অল্প বেতন পেতেন, তাতেই তাঁর চলে যেত। সত্তর জন শিষ্য সর্বদা তাঁর কাছে থাকত। প্রায় তিন হাজার ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছিল। ছাত্ররা তাঁর কাছে ইতিহাস, কাব্য, দর্শনশাস্ত্র এবং চরিত্রগঠন, সংযম ও শিষ্টাচরের নিয়ম-কানুন শিক্ষা করত। তিনি বলতেন,—**"কাব্যে চরিত্র গঠন হয়, আচার-অনুষ্ঠানে তার বিকাশ হয়, আর সংগীতে তার পরিপূর্ণতা ঘটে।"** তিনি সক্রেটিসের মত মুখে মুখে উপদেশ দিতেন, গ্রন্থের ধার ধারতেন না।

একবার লু-র সামন্তরাজের অনুরোধে চুংতু শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন কং-ফু-শি। কিন্তু সামন্ত-রাজ্যের বিলাস-ব্যসন দেখে তিনি লু রাজ্য ছেড়ে চলে যান, পরে অবশ্য আবার ফিরে আসেন। তিনি ৭২ বছর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন।

তাঁর বাণী : কং-ফু-শি পাঁচখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশগুলি সংকলন করে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল মানুষের চরিত্র পবিত্র ও সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্যে। তিনি বলতেন—**প্রত্যেক মানুষ যদি সৎচরিত্র হয়, তাহলে প্রত্যেক গৃহ পবিত্র হবে** ; আর, তখন সমস্ত রাজ্যে সুশাসন আসবে এবং প্রজাদের জীবন সুখময় হবে। তার মতে, তিনিই শ্রেষ্ঠ শক্তিমান মানুষ, যাঁর সদ্‌বুদ্ধি, সৎ-সাহস এবং সৎ-সঙ্কল্প আছে। তাঁর শিক্ষায় 'চুং' (বিশ্বস্ততা), 'সু' (পরার্থপরতা), 'জেন' (মানবিকতা), 'ই' (সত্যনিষ্ঠা), 'লি' (শালীনতা), 'চি' (জ্ঞান), 'সিন' (আন্তরিকতা) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কং-ফু-শির মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ ধীরে ধীরে সারা চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শেষে তাঁর শিক্ষা এক নূতন ধর্মমতে পরিণত হয়। কং-ফু-শির ধর্মমতের সঙ্গে বুদ্ধের মত ও পথের কিছু মিল দেখা যায়।

(গ) চীনের প্রাচীর নির্মাণ : চৌবংশের রাজত্বকালের অবসান (খৃঃ পূঃ ২৪৯)হ'লে চীনের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে হূনদের উৎপাত বেড়েছিল। এর আগে হূনদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে সামন্তরাজারা কোনও কোনও অংশে প্রাচীর তৈরী করিয়েছিলেন। **'চী'ন'** বংশের রাজা **সিং হুয়াংতির** আমলে চীনের মহাপ্রাচীরের গঠন সম্পূর্ণ হয়। বহু বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে চোদ্দ শো মাইল দীর্ঘ পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্যের অন্যতম চীনের এই মহাপ্রাচীর গঠিত হয়। ফলে, চীন চিরদিনের জন্যে হূণ-আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায়।



চীনের মহাপ্রাচীর

(ঘ) **চীন সাম্রাজ্য :** চৌবংশের শেষ রাজা **নান্-ওয়াং** মারা গেলে **চী'ন** নামে সামন্ত রাজ্যের শাসক **ওয়াং চেং** সমস্ত দেশ জুড়ে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গঠন করতে উদ্যোগী হ'ন। ২৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দে ওয়াং চেং চী'ন সিংহাসনে বসেন এবং একে একে সমস্ত সামন্তরাজ্যগুলিকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। অবিরত যুদ্ধে সাফল্যের জন্যে তাঁকে **'চীনের নেপোলিয়ন'** আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ২২১ খৃস্ট পূর্বাব্দে চীনরাজ ওয়াং চেং 'সি হুয়াং তি' অর্থাৎ **'প্রথম সম্রাট'** উপাধি ধারণ করেন। তিনি সামন্ত রাজ্যগুলি নিজের অধীনে এনে সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি চেকিয়াং, ফুকিয়েন ও কোয়ানটাং অঞ্চল জয় করেন ও পরে টংকিং অধিকার করেন। পূর্বে কোরিয়ার রাজা ও উত্তর-পশ্চিমে হূন জাতি তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে চীনরাজের অধীনে চীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। চী'ন বংশের রাজত্বকাল ২০৬ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত, তার পরই **হান** রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয়।

৫·৫। প্রাচীন ভারত

(ক) **আর্যদের আগমন :** আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল, তা আজ সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয় নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আর্যদের আদি বাসভূমি দক্ষিণ-রাশিয়ায় অবস্থিত ছিল। কালক্রমে আর্যগণ নানাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একটি শাখা এশিয়া মাইনর ও ইরান অতিক্রম ক'রে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতের গিরিপথ দিয়ে ভারতে সিন্ধুনদের তীরে প্রথম বসতি স্থাপন করে। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সিন্ধু ও সরস্বতী—এই "সপ্তনদীর দেশে" আর্যরা বসতি করেছিল সম্ভবতঃ খৃস্টের জন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগে। পরবর্তীকালে আর্যরা ক্রমশঃ পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যরা দাক্ষিণাত্যে বসতি বিস্তার শুরু করে। কিন্তু আসাম ও বাঙ্‌লাদেশে আর্যসভ্যতা প্রবেশ করে আরও পরে।

(খ) **বৈদিক সাহিত্য :** আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লেখা। 'বেদ' শব্দটির অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত বেদকে বলা হ'ত 'শ্রুতি'। বেদের চারটি শাখা, যথা,— 'ঋক্', 'সাম', 'যজুঃ' ও 'অথর্ব'। এদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। প্রতিটি বেদ চারভাগে বিভক্ত—'সংহিতা', 'ব্রাহ্মণ', 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ্'। সংহিতা পদ্যে লেখা—এতে যজ্ঞের মন্ত্র, প্রার্থনা ইত্যাদি আছে। ব্রাহ্মণ-অংশ গদ্যে লেখা—এতে যজ্ঞ-বিধির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে বনে বসে যাঁরা ধর্মচিন্তা করতেন, তাঁদের জন্যে দার্শনিক আলোচনা আছে আরণ্যকে। উপনিষদে ব্রহ্ম, আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। উপনিষদ্ বৈদিক সাহিত্যের অন্তে অর্থাৎ শেষে রচিত হয়েছে বলে একে বলা হয় 'বেদান্ত'।

(গ) **আর্যগণের সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক সংগঠন :** বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা আর্যসভ্যতার পরিচয় পাই।

বৈদিক আর্যসমাজ ঃ সমাজ ও সভ্যতার দিক থেকে দুটি যুগের কথা আমরা জানি,—ঋগ্বেদের যুগ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের যুগ এই যুগের পিতা ছিলেন আর্য-পরিবারের সর্বময় কর্তা। সাধারণতঃ প্রত্যেক পুরুষ এক পত্নী বিবাহ করতেন। সমাজে নারীর স্থান ছিল সম্মানিত। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা প্রভৃতি বিদুষী মহিলা সেকালে ঋষির মর্যাদা পেয়েছিলেন। বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। বিধবা বিবাহ তখন অনুমোদন করা হ'ত।

আর্যসমাজে প্রথমে দু'টি **বর্ণ** ছিল—'গৌরবর্ণ আর্য' ও 'কৃষ্ণবর্ণ অনার্য বা 'দাস'। পরে সমাজ 'ব্রাহ্মণ', 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র'—চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। **ব্রাহ্মণরা** পুরোহিত-বৃত্তি, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়ে থাকতেন। **ক্ষত্রিয়দের** কাজ ছিল যুদ্ধ ও দেশ-শাসন। চাষবাস, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব ছিল **বৈশ্যগণের** ওপর। **শূদ্রদের** কাজ ছিল সমাজের উচ্চ তিন-শ্রেণীর সেবা করা।

আর্যদের জীবন চারটি 'স্তর' বা **'আশ্রমে'** বিভক্ত ছিল। একে বলা হ'ত 'চতুরাশ্রম'। প্রথম আশ্রম 'ব্রহ্মচর্য'—এই স্তরে বালককে গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা ও সংযম পালন করতে হ'ত। দ্বিতীয় আশ্রম 'গার্হস্থ্য'। এই আশ্রমে সে বিবাহ ক'রে সংসার-ধর্ম পালন করত। তৃতীয় আশ্রম 'বানপ্রস্থে' সংসার-ভোগের পর বনবাস ও ধর্ম পালন করা হ'ত। শেষ আশ্রম 'সন্ন্যাস'। এই আশ্রমে পরিণত বয়সে সংসারের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে কঠোর তপস্যা ও ঈশ্বরচিন্তায় দিন যাপন করা হ'ত।

ধর্ম ঃ আর্যদের ধর্ম ছিল সরল ও আড়ম্বর-শূন্য। তাদের উপাসনার জন্যে কোন মন্দির বা মূর্তি ছিল না। দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতিপাঠ এবং যজ্ঞের আগুনে ঘি, দুধ, মাংস, সোমরস প্রভৃতি উৎসর্গ করা ছিল তাদের উপাসনা। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করত। আকাশের দেবতা **দ্যৌঃ**, জলের দেবতা **বরুণ**, বজ্র-বৃষ্টির দেবতা **ইন্দ্র**, বায়ুর দেবতা **মরুৎ** তাদের প্রধান

উপাস্য দেবতা ছিলেন। এছাড়া সূর্য, অগ্নি, উষা, পৃথিবী প্রভৃতিকে আর্যরা উপাসনা করত। বহু দেবদেবীর পূজা করলেও আর্যরা কিন্তু এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত এই সকল দেবদেবী একই শক্তির বিভিন্ন রূপ।

রাষ্ট্রব্যবস্থা : আর্যদের রাষ্ট্র ছিল **রাজতান্ত্রিক**। রাজতন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। কতকগুল পরিবার নিয়ে গঠিত হ'ত **গ্রাম**। গ্রাম-প্রধানকে বলা হ'ত গ্রামণী। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টির নাম ছিল 'বিশ্' বা 'জন্'। বিশ্ বা জনের প্রধানকে বলা হ'ত বিশ্পতি, জন্পতি বা রাজন্। রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। তিনি কার্যতঃ '**সভা**' ও 'সমিতি' নামে দুটি পরিষদের পরামর্শ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত হ'ত সভা, আর সাধারণ মানুষদের নিয়ে গঠিত হ'ত **সমিতি**। পুরোহিত, সেনানী প্রভৃতি ছিলেন রাজকর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) **মহাকাব্য :** প্রাচীন ভারতের দুটি মহাকাব্য '**রামায়ণ**' ও '**মহাভারত**' বৈদিকযুগের পরবর্তী কালে রচিত হয়। পণ্ডিতদের মতে মহাকাব্য দুটির রচনাকাল খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। বৈদিক সাহিত্যে কুরু ও পাঞ্চাল রাজাদের কীর্তিকাহিনী পাওয়া যায়। এই সব কাহিনীই মহাভারতের ভিত্তি। এই মহাকাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ।

কেমন করে অযোধ্যার রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনের জন্যে বনগমন করেন এবং লঙ্কার রাজা রাবণকে বধ করে তাঁর পত্নী সীতাকে উদ্ধার করেন—সেই কাহিনী রামায়ণের প্রধান বিষয়বস্তু।

(ঙ) **বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান :** বৈদিক ধর্ম ক্রমে অত্যন্ত জটিল এবং আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হয়ে পড়ে। এই সুযোগে **পুরোহিত-**শ্রেণী সমাজে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ সহজ, সরল ধর্মাচরণের প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে, দেখা দেয়

বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন। নূতন নূতন ধর্মপ্রবর্তকদের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রবর্তক **মহাবীর** এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক **গৌতম বুদ্ধের** নাম উল্লেখযোগ্য।

মহাবীর ঃ মোট চব্বিশজন ধর্মগুরু বা **তীর্থংকরের** চেষ্টায় জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। মহাবীর শেষ তীর্থংকর। তিনি উত্তর বিহারে কুন্দপুরে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশলা। মহাবীরের পূর্বের নাম ছিল **বর্ধমান**। যৌবনে বিবাহ করে মহাবীর কিছুদিন সংসার-জীবন যাপন করেন। ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন ও কঠোর তপস্যা করেন। বারো বছর পর তিনি কৈবল্য বা পরমজ্ঞান লাভ করেন।



মহাবীর

তখন তিনি **'জিন'** (বা বিজয়ী) এবং **'নিগ্রন্থ'** (বা বন্ধনমুক্ত) নামে পরিচিত হন। তাঁর নাম হয় **মহাবীর**। 'জিন'-এর শিষ্যরা **'জৈন'** নামে পরিচিত হন। জীবনের বাকী সময় তিনি ধর্মপ্রচার করে কাটাবার পর পাবাপুরীতে অনশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

জৈন ধর্মমত ঃ জৈনরা বিশ্বাস করেন মহাবীর জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন নি, জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন **পার্শ্বনাথ**। চিত্ত-সংযমের জন্যে পার্শ্বনাথ তাঁর শিষ্যদের চারটি উপদেশ দিতেন ঃ (১) কাউকে হিংসা করবে না, (২) মিথ্যা কথা বলবে না, (৩) চুরি করবে না এবং (৪) কোন বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হবে না। এই চারিটি নিয়মের সঙ্গে মহাবীর আর একটি নিয়ম যোগ করলেন, তা হ'ল (৫) ব্রহ্মচর্যপালন। জৈনধর্মে **সম্যক্ বিশ্বাস, সম্যক্ জ্ঞান ও সদাচার পালন**—এই **'ত্রিরত্নের'** ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। জৈনরা শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী। তাঁদের ধারণা পৃথিবীর

সব জিনিসেরই প্রাণ আছে। সেজন্য অহিংসা নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গৌতম বুদ্ধ ঃ মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী-বনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোদন, মাতা ছিলেন মায়াদেবী। বাল্যনাম ছিল সিদ্ধার্থ। ষোল বছর বয়সে যশোধরা (মতান্তরে গোপা) নামে একটি কন্যার সঙ্গে গৌতমের বিবাহ হয়। কিন্তু সংসার তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। কথিত আছে, একজন বৃদ্ধ, একজন রোগী ও একটি মৃতদেহ দেখে তিনি সংসারের অশেষ দুঃখের কথা অনুভব করেন। তারপর একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে তিনি আনন্দ লাভ করেন। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে রাহুল নামে একটি পুত্র-সন্তান জন্মাবার পর একদিন গভীর রাত্রে তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান।



বুদ্ধদেব

সন্ন্যাস নিয়ে গৌতম বিহারের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে বর্তমান বোধগয়ায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি পিপ্পল গাছের নীচে সাধনার দ্বারা তিনি পরমজ্ঞান লাভ করেন। সেই সময় থেকে তিনি 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হলেন। 'বুদ্ধ' মানে জ্ঞানী, তথাগত—পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন যিনি।

বোধিলাভের পর তিনি বারাণসীর কাছে মৃগদাবে (বর্তমানে সারনাথ) এবং পরে মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে ধর্মপ্রচার করেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে প্রচার করার পর কুশীনগরে (গোরক্ষপুর জেলায়) আশী বছর বয়সে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন।

ধর্মমত ঃ বুদ্ধদেবের শিক্ষার মূলকথা হ'ল—(১) মানব জীবনে দুঃখ আছে ; (২) দুঃখের কারণ হ'ল কামনা-বাসনা ; (৩) দুঃখ হ'তে নিষ্কৃতি প্রয়োজন ; (৪) দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় কামনা-বাসনা জয় করে **নির্বাণ-লাভ**, অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি। বুদ্ধের মতে নির্বাণলাভের উপায় **সম্যক্ দৃষ্টি, সদ্-বাক্য, সৎ-কর্ম, সৎ-সংকল্প সৎ-জীবন, সৎ-চেষ্টা, সৎ-স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি**। এগুলি '**অষ্টাঙ্গিক, মার্গ**' নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসন বা অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন—এ দুয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি '**শীল**' অর্থাৎ কতকগুলি গুণের অনুশীলন করতে উপদেশ দিতেন।

(চ) প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য

(১) **মৌর্য যুগ ঃ** খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধকে (দক্ষিণ বিহার) কেন্দ্র করে নন্দ বংশের রাজারা উত্তর ভারতে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দ বংশ ধ্বংস ক'রে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

চন্দ্রগুপ্ত (আঃ ৩২৪—৩০০ খৃঃ পূঃ) ঃ আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে মগধে মৌর্য বংশের শাসন শুরু হয়। এই **মৌর্য-বংশের** প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনি সম্ভবতঃ পিপ্পলিবনের 'মোরিয়' নামে এক ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন।

তক্ষশীলাবাসী ব্রাহ্মণ **চাণক্য** বা **কৌটিল্যের** সাহায্যে নন্দরাজ ধননন্দকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কিছু পরেই তিনি গ্রীকদের তাড়িয়ে পাঞ্জাব দখল করেন। আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি সেলিউকস পাঞ্জাব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্থান—এই চারটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে আসেন।

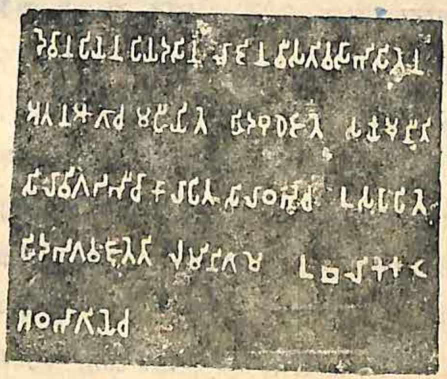
বিন্দুসার (আঃ ৩০০—২৭৩ খ্বঃ পূঃ) ঃ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর মৌর্য সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। অনেকে মনে করেন, তাঁর সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য মহীশূরের চিতলদ্রুগ-জেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।



অশোক

অশোক (আঃ ২৭৩—২৩২ খ্বঃ পূঃ) ঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মগধের রাজা হন তাঁর পুত্র **'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী'** অশোক। বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে ২৭৩ খৃস্ট-পূর্বাব্দে সিংহাসনে বসলেও তাঁর অভিষেক হয় চার বছর পরে ২৬৯ খৃস্ট-পূর্বাব্দে।

রাজাহয়ে অশোক রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। রাজ্যাভিষেকের আট বছর পরে তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধে রক্তক্ষয় দেখে তাঁর মনে গভীর অনুশোচনা দেখা দেয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর কখনও যুদ্ধ করবেন না। তখন থেকে



অশোকের শিলালিপি

তাঁর ব্রত হ'ল, মানবের কল্যাণসাধন। তিনি **উপগুপ্ত** নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অশোক ঘোষণা করলেন, আর দিগ্বিজয় নয়, **'ধর্মবিজয়'** অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের দ্বারাই তিনি মানুষের হৃদয় জয় করবেন। অশোকের আমলে তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে বঙ্গ থেকে পশ্চিমে সুরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। **'লেখমালা'**র সাক্ষ্যে একথা বলা যায়। বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্যে অশোক রাজুক, ধর্ম-মহামাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। **প্রজারা ছিল তাঁর সন্তানের মত।** প্রজাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ছিল দেবপ্রিয় অশোকের একমাত্র কাম্য। তিনি তাঁর অনুশাসনগুলির মাধ্যমে কল্যাণ-ধর্মের প্রচার করেন। তাই এগুলি **'ধর্মলিপি'** নামে পরিচিত। তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধ-ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়। অশোকের মৈত্রী ও শান্তির নীতি আজ বিশ্বের আদর্শ।

(২) **কুষাণ যুগ :** মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর ভারতবর্ষে অরাজকতা শুরু হয়। এই অরাজকতার সুযোগে গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণরা এদেশে আসে ও শাসন করে। কুষাণরা ছিল মধ্য এশিয়ার চীনসীমান্তের অধিবাসী **ইউ-চি** জাতির একটি শাখা। কুষাণ শাখার প্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন **কুজুল কদফিসিস**। তিনি ইউ-চি জাতির পাঁচটি শাখাকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। পারস্যের সীমা থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য ছিল। তাঁর পুত্র **বিম কদফিসিসের** রাজ্য ছিল গন্ধার থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত। ধর্মে তিনি ছিলেন শৈব। তাঁর পরবর্তী কুষাণরাজ কণিষ্ক ছিলেন কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা।

কণিষ্ক : অনুমান, কণিষ্ক **৭৮ খৃস্টাব্দে** সিংহাসনে বসেন এবং তিনিই **'শকাব্দের'** প্রচলন করেন। তাঁর সময়ে কুষাণ সাম্রাজ্য সর্ববৃহৎ আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষে তাঁর রাজ্য পশ্চিমে গন্ধার ও কাশ্মীর থেকে পূর্বে বারাণসী এবং দক্ষিণে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের

উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার কাসগড়, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর শাসনধীন ছিল। কণিষ্কের রাজধানী ছিল **পুরুষপুর** বা বর্তমান পেশোয়ার। কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমলে **চতুর্থ বৌদ্ধধর্ম মহাসম্মেলন** হয়েছিল।

কণিষ্কের পরবর্তী আমলে তাঁর সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়। **প্রথম বাসুদেবের** আমলে কুষাণদের রাজ্য মথুরা ও তার চারপাশে বিস্তৃত ছিল। খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইউ-চি জাতির অধিকার উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছিল। গুপ্তদের অভ্যুত্থান পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণরা তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল কোনও মতে।

(৩) **গুপ্তসাম্রাজ্য :** কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দেয়। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত রাজারা ক্ষমতা দখল ক'রে মগধকে কেন্দ্র ক'রে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত : মহারাজ **শ্রীগুপ্তের** পৌত্র এবং মহারাজ **ঘটোৎকচগুপ্তের** পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়ে মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি **৩১৯-২০ খৃস্টাব্দে 'গুপ্ত সম্বৎ'** নামে একটি নূতন অব্দের প্রচলন করেন। বাংলা, বিহার এবং উত্তর-প্রদেশের এলাহাবাদ ও অযোধ্যা পর্যন্ত তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত (আঃ ৩৫০-৩৭৫ খৃঃ) : প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। সভাকবি হরিষেণ-রচিত **এলাহাবাদ-প্রশস্তি** থেকে সমুদ্র-গুপ্তের সামরিক কীর্তির কথা জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের কিছু অংশ জয় করেন। কামরূপ, নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও মালব তাঁকে কর দিত। দক্ষিণ-ভারতের কোশল, কাঞ্চী প্রভৃতি রাজ্য জয় করেও তিনি প্রত্যক্ষ শাসনঅধীন রাখেন নি, তাদের আনুগত্য পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। পশ্চিম ভারতের শক ও কুষাণ রাজগণ এবং

সিংহলের রাজা **মেঘবর্মা** তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। তাঁর রাজধানী ছিল **পটালিপুত্র** (বর্তমান পাটনা)।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (আঃ ৩৭৫-৪১২ খৃঃ) : সমুদ্রগুপ্তের পর রাজা হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ইনি **'বিক্রমাদিত্য'** উপাধি নেন। মধ্যভারতের নাগবংশ এবং দাক্ষিণাত্যের বাকাটক বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। পরে তিনি শকদের পরাজিত করে মালব ও সুরাষ্ট্র অধিকার করেন। এতে গুপ্ত সাম্রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শকদের পরাজিত করেন বলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে **'শকারি'** বলা হয়। উজ্জয়িনীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

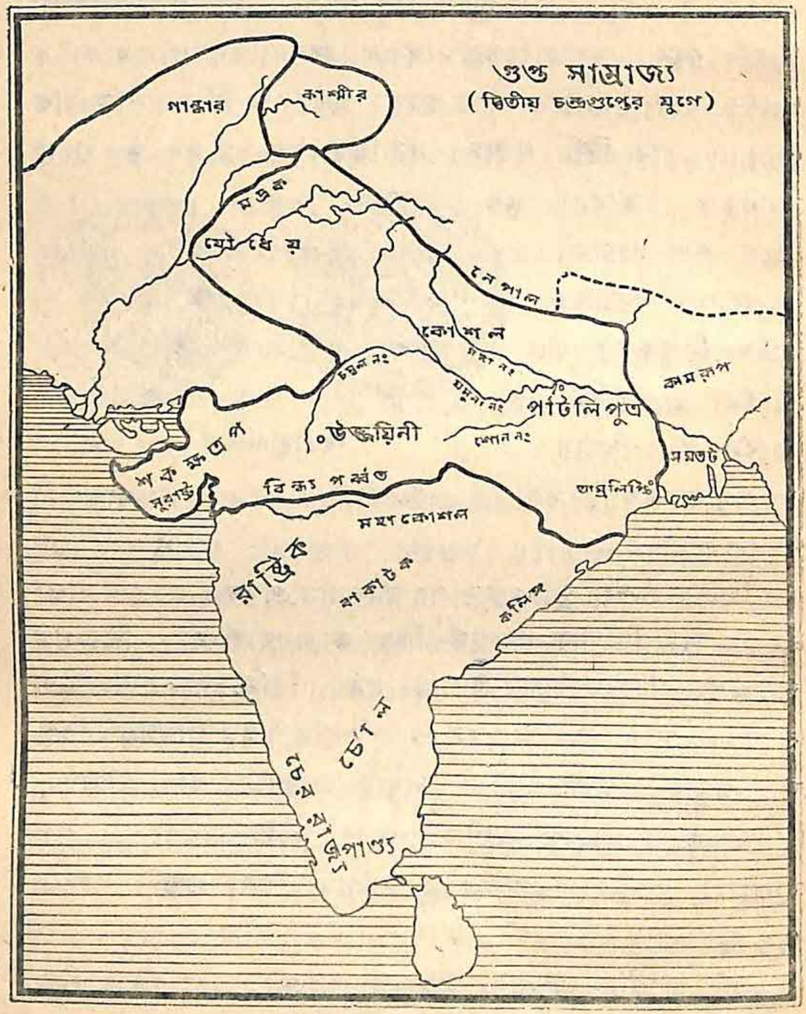


দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম কুমারগুপ্ত** রাজা হন। তাঁর দিগ্বিজয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাঁর পুত্র **স্কন্দগুপ্তও** 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নেন। তিনি হূণদের পরাজিত ক'রে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যেই বারবার হূণ আক্রমণ, প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা ও পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের মধ্যে সিংহাসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(ছ) **প্রাচীন বাংলা :** ঐতরেয় আরণ্যক, বোধায়ন সূত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় **'বঙ্গের'** উল্লেখ আছে। বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতে **পুণ্ড্র, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত** প্রভৃতি রাজ্যে বাংলা দেশ বিভক্ত ছিল। সিংহলের 'মহাবংশ'

থেকে বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ের কথা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে 'রাঢ়' নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। জৈনগ্রন্থে সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমির পরিচয় আছে। সেকালে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে



বিভক্ত ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা প্রবেশ করেনি।

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি জয় করে পূর্বে বিপাশা নদীর তীরে এসে পৌঁছান।

গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই সময় মগধের (প্র্যাসিয়য়) রাজা ছিলেন নন্দরাজ ধননন্দ। ধননন্দের অধীনে ছিল বাংলাদেশ (গঙ্গারিডি)। এই বাংলাই সম্ভবতঃ ছিল নন্দরাজদের শক্তির একটি প্রধান উৎস। তাঁদের বিরাট হস্তিবাহিনী এখান থেকেই সংগৃহীত হ'ত। মগধরাজের বিশাল চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনীর কথা শুনেই সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডার ফিরে যান। মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত এর পর মগধের রাজা হন। **মহাস্থানে** (বগুড়ায়) পাওয়া একখানি লেখ ইঙ্গিত করে উত্তর-বঙ্গে মৌর্য-শাসনের কথা।

মৌর্য-শাসন শেষ হবার পর বাংলাদেশ আবার স্বাধীন হয়। গ্রীক ঐতিহাসিক বাংলার অধিবাসীদের বীরত্ব ও সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় লেখা **'পেরিপ্লাস'** নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে গঙ্গা নদীর মোহনায় প্রধান বন্দরনগর ছিল **'গঙ্গে'**। **টলেমির 'ভূগোলে'** তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। টলেমি খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর ভূগোল রচনা করেন।

গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আর্য-সভ্যতার বিস্তার সম্পূর্ণ হয়। বাংলাদেশের কিছু অংশ সম্ভবতঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে ছিল। সমুদ্রগুপ্ত **পোখরনার** (বাঁকুড়া জেলার) রাজা চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেন। তাঁর সাম্রাজ্য সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তের সময়ে 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' নামে বাংলাদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তার প্রমাণ **দামোদরপুর লেখমালা**।

গুপ্ত শাসনের অবসান হলে বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। ঐ সময়কার তিনজন বাঙালী রাজার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন **গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব**। তাঁরা পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে শাসন করতেন। তাঁদের নাম **ফরিদপুর তাম্রশাসনগুলিতে** উল্লিখিত আছে।

(জ) **ভারতের সঙ্গে বিদেশীদের যোগাযোগ :** একদিকে হিমালয় পর্বত ও অন্য তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও

ভারতবর্ষ কোনদিন অপর দেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন একক জীবন যাপন করেনি। বহুদিন আগে থেকেই ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করে এসেছে। এই যোগাযোগের প্রধান প্রেরণা ছিল বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লেখা বিবরণ থেকে জানা যায় খৃস্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে রোমের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছিল। ভারতীয় বণিকরা বা ধর্মপ্রচারকরা বিদেশে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে এবং বিদেশী সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করে।



প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে যে সব দেশের যোগাযোগ গড়ে ওঠে, সেগুলি হ'ল মধ্য এশিয়ার খোটান, কুচ্, তুরফান প্রভৃতি স্থান ; পূর্ব-এশিয়ার চীন, জাপান ও কোরিয়া ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চম্পা (বর্তমানে ভিয়েতনাম), কম্বোজ (বর্তমান কাম্বোডিয়া), মালয় উপদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল এবং সিংহল ও তিব্বত।

ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া ঃ কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত ভূভাগকে বলা হয় মধ্য এশিয়া। খোটান অঞ্চলে খনন-কার্য চালিয়ে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ **স্যার অরেল স্টাইন** বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় ভাষায় লেখা বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। কাশগড়, খোটান, সমরকন্দ প্রভৃতি এলাকায় যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা দেখে তিনি অনুমান করেন, ঐ সমস্ত অঞ্চলে এক সময় ভারতীয়দের বসতি ছিল। খোটানী কিংবদন্তী-অনুসারে মহারাজ অশোকের সময় ভারতবাসিগণ তক্ষশিলা থেকে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেছিল। যদিও অনেকদিন আগে থেকেই মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের যাতায়াত ছিল, তবুও এ অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার প্রধানতঃ বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের কীর্তি। রোম ও চীনের প্রান্তভাগ থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হয়ে একটি স্থলপথে বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। কুষাণ আমলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। **খোটান** অঞ্চলের বৌদ্ধ-বিহারের দেওয়ালে যে চিত্র পাওয়া যায়, তা গুপ্ত আমলের গুহাচিত্রের অনুরূপ। **হিউয়েনসাং** এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য দেখে বিস্মিত হন।

ইসলামের বিজয়-অভিযান ও ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(ঝ) **বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ ঃ** খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে ভারতবর্ষে **মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন** প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক এসেছেন। তাঁদের লিখিত বিবরণে ভারতের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

মেগাস্থিনিস ঃ মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সিরিয়ার অধিপতি সেলিউকসের রাজসভা থেকে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আসেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কিছুদিন থাকেন এবং

মৌর্যযুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও শাসন সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ লিখে যান। এই বিবরণ-সম্বলিত গ্রন্থের নাম **'ইণ্ডিকা'**।

মেগাস্থিনিস ভারতের মানুষদের সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন—**কৃষক, পশুপালক, দার্শনিক, শিকারী, শিল্পী ও বণিক, সৈনিক** এবং **সভাসদ্‌**। মনে হয়, এই শ্রেণীভেদ জীবিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মেগাস্থিনিস **ক্রীতদাস-প্রথার** কথা বলেন নি।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ-অনুসারে, জনগণ চন্দ্রগুপ্তের আমলে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করত। ঐ সময় দেশে খাদ্য ছিল প্রচুর। জমির উর্বরতাও ছিল। বেশীর ভাগ লোক ছিল কৃষিজীবী।

দেশে শহরের সংখ্যা ছিল অনেক। শহরে বাস করতেন ধনী ব্যক্তি ও বণিকরা। জনগণের চরিত্র ছিল ভাল। দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না বললেই হয়। কেউ মিথ্যা কথা বলত না, মদ্যপান করত না। ঝগড়া-ঝাটির মীমাংসা আপোষের দ্বারাই হ'ত। দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

মৌর্য সমাজে নারীরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজার দেহরক্ষার ভার ছিল নারী-রক্ষীদের ওপর।

ফা-হিয়েন : গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতভ্রমণে আসেন। তিনি প্রায় দশ বছর ভারতে থাকেন। তিনি **'মধ্য ভারতের'** এক বিবরণ রেখে যান। তাঁর বর্ণনা-অনুসারে, পাটলিপুত্র ছিল একটি সমৃদ্ধ নগর। এখানকার অধিবাসীরা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করত। সম্রাট অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ দেখে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, এত সুন্দর প্রাসাদ মানুষের দ্বারা তৈরি হতে পারে।

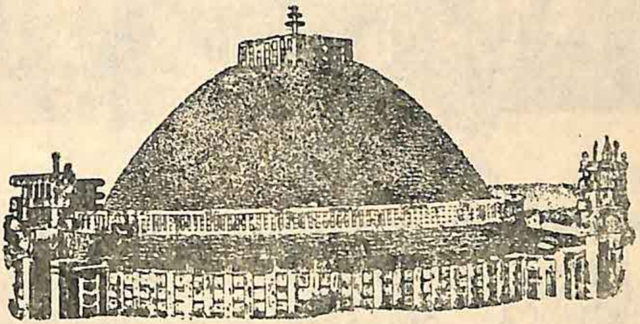
ফা-হিয়েনের দৃষ্টিতে মগধবাসীর আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল। প্রজারা ধর্মশালা, অতিথিশালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন ও পরিচালনার জন্যে মুক্তহস্তে দান করত। প্রজারা উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর দিত। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর

ছিল তাম্রলিপ্ত। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলত। দেশের ভেতর বেচাকেনার জন্যে **কড়ির** ব্যবহার ছিল।

গুপ্ত রাজাদের শাসন ছিল খুবই ভাল। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। গৃহস্থেরা রাত্রে নির্ভয়ে দরজা খুলে ঘুমোতে পারত। বিশেষ কারণ ভিন্ন প্রজারা আদালতে যেত না। দণ্ডবিধিও তেমন কঠোর ছিল না।

(ঞ) ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান :

শিল্পকলা : প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য ছিল উন্নতমানের। সিন্ধু সভ্যতার আমলে যে সমস্ত খেলার পুতুল,



সাঁচী স্তূপ

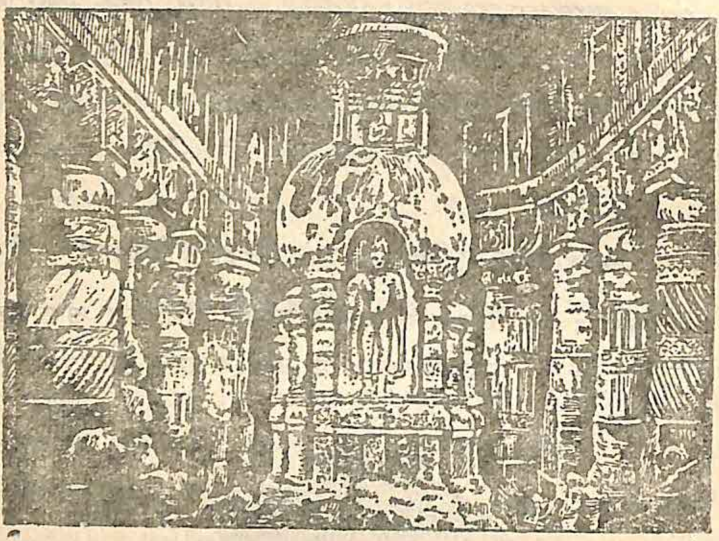
মাটির পাত্রের গায়ে ছবি, বাড়ীঘরের নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে, সীলমোহরের গায়ে যে সমস্ত জীবজন্তুর ছবি উৎকীর্ণ আছে, তা দেখে মনে হয়, তারা শিল্পকলায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। বৈদিক যুগে ঠিক সেই ধারাটি না থাকলেও মনে হয়, এঁরা কলা-বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা করতেন।



সাঁচীতোরণের শীর্ষ

মৌর্য যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়। **মেগাস্থিনিস, স্ট্রাবো** ও **অ্যারিয়ানের** লেখা থেকে মৌর্য রাজপ্রাসাদের যে বিবরণ পাওয়া

যায়, তাতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ কাঠের তৈরি হলেও পারস্যের রাজপ্রাসাদের চেয়ে ছিল মনোরম। প্রস্তর দিয়ে স্থাপত্য



অজন্তার গুহা

এবং ভাস্কর্য শিল্পে নবযুগ আসে মহারাজ অশোকের সময়। অশোকের ঘণ্টাকৃতি স্তূপ, সাঁচীস্তূপ ও সারনাথের চতুঃসিংহশীর্ষক স্তম্ভ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এযুগে বৈদেশিক প্রভাবে ভারতীয় শিল্প এক নূতন রূপ গ্রহণ করেছে।



চতুঃসিংহচুড়া

গ্রীক আক্রমণের ফলে ভারতীয় শিল্পরীতির ওপর সামগ্রিকভাবে কোন প্রভাব না পড়লেও গন্ধার অঞ্চলে রোমান ও গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাব পড়ে। কুষাণ যুগে এই অঞ্চলেই এক নূতন শিল্পের উদ্ভব হয়। একে বলা হয় **'গন্ধার শিল্প'**। গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির মিশ্রণেই এই শিল্প গড়ে ওঠে।

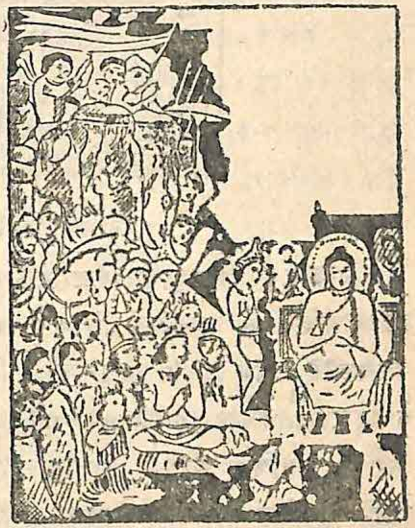
গুপ্তযুগে ধাতুশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ দেখা দেয়।

এই যুগের **চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ** (দিল্লীতে কুতুবমিনারের পাশে অবস্থিত) দেড়হাজার বছরের পুরানো হলেও আজ পর্যন্ত কোন মরিচা ধরেনি। মহারাষ্ট্রে **ইলোরা ও অজন্তার গুহাসকল** ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সুন্দরতম নিদর্শন।

সাহিত্য: আমাদের প্রাচীন সাহিত্য—**বেদ ও উপনিষদ**। এছাড়া **রামায়ণ ও মহাভারত** এই মহাকাব্য দুটিও বহু পুরানো যুগে রচিত। মৌর্য-যুগে অশোকের শিলা-লিপির মাধ্যমে **প্রাকৃত ভাষা** যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। কুষাণ-যুগে মহাকবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত



মা ও ছেলে (অজন্তা)



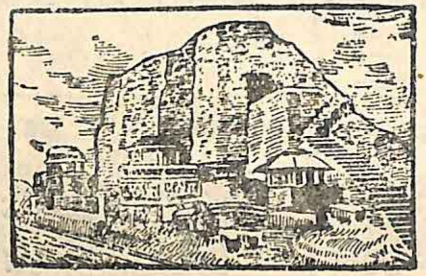
বুদ্ধের ধর্মপ্রচার (অজন্তা)

ভাষায় **'বুদ্ধচরিত'** নামে মহাকাব্য রচনা করেন। গুপ্তযুগে বহু কবি ও নাট্যকারের আবির্ভাব হয়। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি **হরিশেষণ**, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় মহাকবি **কালিদাস, শূদ্রক, বিশাখদত্ত** প্রভৃতি মনীষাদের সাহিত্য-কীর্তি অমর হয়ে আছে।

শিক্ষা : তক্ষশিলা ছিল প্রাচীন যুগে একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। বহু দূর-দূরান্তর থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। এখানে

ছাত্রদের বেদ ছাড়াও বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

নালন্দা বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণের চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে। এখানে দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র বিনা খরচায় থেকে পড়াশুনা করত। হর্ষবর্ধনের আমলে পণ্ডিত **শীলভদ্র** ছিলেন নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান : গুপ্তযুগে বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়। **আর্যভট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত** ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। আর্যভটই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী প্রত্যহ নিজের অক্ষরেখার চারধারে একবার ঘোরে এবং এই ঘোরা অবস্থাতেই বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। গণিতশাস্ত্রেও আর্যভটের দান স্মরণীয়। তিনি দশমিক সংখ্যার ব্যবহার প্রবর্তন করেন। **ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী'** ও **শ্রীধরের 'গণিতসার'** এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই যুগে রসায়ণ-শাস্ত্র, ভেষজ-বিদ্যা, শরীর বিজ্ঞান এবং শল্য-চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ তখন পশুদেহের ওপর অস্ত্রোপচার করে শারীরবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করতেন। **চরকসংহিতা** ও **সুশ্রুত-সংহিতায়** সেকালের ভেষজ-বিদ্যার কতদূর উন্নতি হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

পরিশিষ্ট

(১) প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ

পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, মানুষের সমাজে প্রতি যুগে ছিল দুটি শ্রেণী, **সুবিধা-ভোগী** আর **সুবিধা-বঞ্চিত**। যারা সুবিধা-বঞ্চিত, তারাই উৎপাদন করে, তাদের পরিশ্রমেই সভ্যতা গড়ে ওঠে ; যারা সুবিধাভোগী, তারা বিনা পরিশ্রমে দেশের উৎপাদন নিজেদের ভোগবিলাসে লাগায়, তারা উৎপাদনকারী সাধারণ মানুষকে শাসন ও শোষণ করে বড়লোক হতে চায়। কিন্তু এই অবস্থা তো চিরদিন চলতে পারে না। সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষরা পীড়ন আর দুঃখ ভোগ করতে করতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে। সমাজের যারা অভিজাত, বড়লোক, তাদের হাতেই থাকে উৎপাদনের উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ। সেই অধিকার-লাভের জন্যে লড়াই চলতে থাকে দু'শ্রেণীর মধ্যে। অবশেষে, সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণী সমাজে সব রকম সুযোগ-সুবিধা আদায় ক'রে নিতে পারে। যেমন প্রাচীন রোমে **প্লেবিয়ানরা** তাদের লড়াই চালিয়ে **প্যাট্রিসিয়ানদের** সমান অধিকার লাভ করেছিল। আগে যারা সুবিধা-বঞ্চিত ছিল, তারা হয়ে যায় সুবিধা-ভোগী শ্রেণীভুক্ত ; তখন গড়ে ওঠে নূতন আর একটি সুবিধা-বঞ্চিত, শোষিত শ্রেণী। যেমন, প্রাচীন রোমে ছিল **ক্রীতদাস-শ্রেণী**। কিছুদিন পীড়ন ভোগ ক'রে তারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শুরু হয় নূতন ক'রে সমাজের দু'টি শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম। এমনিভাবে মানুষের সমাজের চেহারা ক্রমশঃ পাল্টাতে থাকে, মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

এই নিয়মে মানুষের সমাজ বদলেছে সভ্য যুগের গোড়া থেকেই। তার আগে অর্থাৎ আদিম বর্বর যুগে মানুষের সমাজে কোনও শ্রেণীবিভাগ ছিল না, তখন সবাই সমান অধিকার ভোগ করত। শিকার ক'রে যা পাওয়া যেত, সবাই সমান অধিকার ভোগ করত। এই যুগকে বলা হয় **'আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ'**। যখন থেকে মানুষ

সভ্য হ'ল, উর্বর মাটিতে চাষ করে অনেক ফসল ফলাতে লাগল, খেয়ে দেয়ে খাবার আরও বাড়তি থেকে যেতে লাগল, ক্রমে শহুরে সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকল, পাথরের যুগ ছেড়ে মানুষ তামার যুগে পা দিল, তখন থেকেই সমাজে দেখা দিল জীবিকার ভিত্তিতে নানা শ্রেণী। মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা—সব দেশেই কাজের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই শ্রেণীগুলির সবাই যে দেশের সম্পদ উৎপাদন করত, তা নয়। যারা হাতে কাজ না করে লোক খাটিয়ে উৎপাদন করত, তারা হ'য়ে দাঁড়াল সুবিধা-ভোগী শ্রেণী। যারা উৎপাদন করত, তাদের মধ্যে আবার নানা স্তর ছিল। যেমন—কৃষক বণিক, শিল্পী ইত্যাদি। এদের মধ্যে কৃষকদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ, অথচ কৃষির ওপর ভিত্তি করেই শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি উন্নত হয়েছিল। যাই হোক, প্রথম দিকে যারা চাষ-বাস করত, তাদের এমনি স্বাধীনতা ছিল ; কিন্তু ক্রমশঃ সেই স্বাধীনতাটুকু হারিয়ে তারা দাসে পরিণত হ'ল। এর কারণ তাদের দরিদ্র অবস্থা, আর তার সুযোগ নিলেন রাজা আর তাঁর পরিষদ্-সভাসদ, অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা। বিনা পারিশ্রমিকে দাসকে বেগার খাটিয়ে জমিদার-শ্রেণী বেশ লাভজনক চাষ-বাস করতে লাগলেন। পরে এই সব দাস তাঁরা অন্য দেশ থেকে কিনে আনতেন বলে এদের নাম হয়েছিল **'ক্রীতদাস'**। আসলে, অসংখ্য যুদ্ধবন্দী সৈনিকও ক্রীতদাসে পরিণত হ'ত। আর, ঋণ করে শোধ দিতে না পেরে মহাজনের ক্রীতদাস হ'য়ে যাওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটত। এমনি করে মানুষের সমাজ ধীরে ধীরে দাসপ্রথার যুগে পদার্পণ করে। এই যুগে দাসদের উৎপাদনের দ্বারা প্রধানতঃ সমাজ চলত। প্রাচীন মিশরে দাসপ্রথা ছিল। গ্রীস ও রোমের সভ্য সমাজের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল দাসপ্রথার ওপর ভিত্তি ক'রেই।

দাসপ্রথার অবসান হ'তেই প্রাচীন যুগের সমাজ মধ্যযুগে পদার্পণ করে। রোমকে কেন্দ্র ক'রে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য গড়ে

উঠেছিল। কার্থেজ ধ্বংস করে, সিসিলি, স্পেন, গ্রীস, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরে গ্রীক অধিকৃত এলাকাগুলি জয় করে রোমান সেনানায়করা গড়েছিলেন এই সাম্রাজ্য। রোমের অভিজাতরা নববিজিত দেশগুলি থেকে অগাধ ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে হাজার হাজার দাস সংগ্রহ ক'রে সমাজের সবচেয়ে ওপরতলায় বসেছিলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড় জমিদারী গড়ে তোলেন। এই সব জমিদারী ছিল প্রায় এক একটি প্রদেশ। জমিদারীতে জমিদাররা চাবুক দিয়ে দাস, কর্মচারী ও চাষীদের কাজের তদারক করতেন। কিন্তু দাসরা বিদ্রোহ করেছে। বারবার দাস-বিদ্রোহ হয়েছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে খৃঃ পূঃ ৭৩ অব্দে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে দাসদের আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। তাই রোমের সম্রাটরা এই ধর্মপ্রচারে বাধা দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ধনী ও দরিদ্র সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য এই ধর্মকে সম্রাট **কনস্ট্যান্টাইন** স্বীকার করে নেন।

যাই হোক, জমিদারশ্রেণী ক্রমশঃ দেখলেন যে, দাস সংগ্রহ সুলভে হচ্ছে না, দাসদের ভরণপোষণে ব্যয় হচ্ছে প্রচুর, অথচ সেই অনুপাতে শস্য-উৎপাদন লাভজনক হচ্ছে না, তখন তাঁরা চাষ-বাসের কাজে ক্ষেত-মজুর, ভাগ-চাষী, খাজনা দিতে স্বীকৃত প্রজা প্রভৃতির পত্তন করতে লাগলেন। আগেকার দাসপ্রথার স্থলে **ভূমিদাসপ্রথা** বা **সার্ফ**-প্রথার প্রচলন হতে লাগল। এই সব সার্ফরা ভূমির সঙ্গে বাঁধা ছিল, অর্থাৎ প্রভুর জমি ও গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারত না। তাদের নিজেদের এক-আধটু চাষবাসের জমি থাকত কখনও কখনও, তার জন্যে তাদের খাজনা দিতে হ'ত, আবার মনিবের জমিতে বেগার খাটতেও হ'ত। রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সার্ফ বা ভূমিদাসের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। জমিদার তাঁর নিজের এলাকায় ছিলেন সর্বময় কর্তা বা প্রভু। এই এলাকার নাম ছিল '**ম্যানর**'। জমিদারদের নিজেদের অধিকার থাকত কিছুটা খাস জমি আর বাকিটা বন্দোবস্ত দেওয়া হ'ত সার্ফ বা ভূমিদাসদের কাছে।

'ম্যানর' বা জমিদারীর এলাকা ছোটবড় ছিল। জমিদারদের মধ্যেও ছোটবড় ছিল। ছোটর ওপর বড়, তার ওপর আরও বড় জমিদার, সবার ওপর ছিলেন রাজা। এমনিভাবে গড়ে উঠেছিল যে সমাজ, তাকে বলা হয় **'ফিউডাল'** বা **'সামন্ততান্ত্রিক সমাজ'**। বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদাররা ছিলেন রাজার সামন্ত, তাঁদের সহায়তা নিয়েই রাজাকে রাজ্যশাসন করতে হ'ত, তাঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত দেশের অর্থনীতি। গ্রামীণ সমাজের কর্তা ছিলেন সামন্তরা। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্র দেখা দিয়েছিল।

যদিও পূর্বদিকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দাসপ্রথা ও এশিয়ার সামন্ততন্ত্র পাশাপাশি রেখে দীর্ঘকাল টিঁকে ছিল খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে তুর্কি আক্রমণ পর্যন্ত, কিন্তু পশ্চিমে রোমান সভ্যতা ও সমাজের বৈশিষ্ট্য খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতেই লুপ্ত হয়ে যায়। খৃস্টীয় ২৪০-৪০০ অব্দের মধ্যে রোম সাম্রাজ্য টিঁকিয়ে রাখার জন্যে সম্রাটরা নিজেদের অধিক শক্তিশালী করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন প্রজা-জনসাধারণের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে। চেষ্টা হয়েছিল সম্রাটকে দেবতা করে সাম্রাজ্যকে সুসংহত করবার। কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের দিকে দিকে সামন্তরা ছোট ছোট রাজাতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই সাম্রাজ্যকে আর বাঁচানো গেল না, প্রাচীন রোমের সমাজকেও নয়। প্রাচীন যুগের অবসানে দেখা দিল **'মধ্যযুগ'**।

---

(২) কালক্রম

খৃস্টপূর্ব	৩০০,০০০	:	আদিম মানুষের আবির্ভাব, খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষ, আগুনের আবিষ্কার। প্রাগৈতিহাসিক যুগ : পুরানো প্রস্তর যুগ
”	৮০০০	:	প্রাগৈতিহাসিক যুগ : নূতন প্রস্তর যুগ
”	৩০০০-১৫০০	:	তামার যুগ
”	৩০০০-২৫০০	:	মিশরে পিরামিড-যুগ
”	২৮৫২-২২০৫	:	চীনে পঞ্চশাসকের যুগ
”	২০০০	:	মিশরের সামন্ত যুগ ; মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা।
”	২৪০০-১৭০০	:	সিন্ধু সভ্যতা
”	১৭৫০	:	ব্যাবিলনের হামুরাবির রাজত্বকাল
”	২২০৫-১৭৬৬	:	চীনে সিয়া বংশের রাজত্বকাল
”	১৭৬৬-১১২২	:	চীনে স্যাং বংশের রাজত্বকাল
”	১৫৮০-১১৫০	:	মিশরে সাম্রাজ্যের যুগ
”	১৫০০	:	আর্যদের ভারতে আগমন
”	১৫০০-৮০০	:	বৈদিক যুগ
”	১০০০	:	আর্যদের গ্রীসে আগমন
”	১১২২-২৫৫	:	চীনে চৌ-বংশের রাজত্বকাল
”	৯০০	:	প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বসতিস্থাপন
		:	গ্রীসে নগর-রাষ্ট্রের উৎপত্তি
”	৮০০	:	ইহুদি ধর্মনেতা মোজেসের আবির্ভাব ; রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা
”	৭০০	:	হোমারের ‘ইলিয়াড’ রচনা গ্রীসের উপনিবেশ বিস্তার
”	৬০০	:	ভারতে বুদ্ধ, ইরাণে জরথুষ্ট্র ও চীনে কন্‌ফুশিয়াসের আবির্ভাব

খৃস্টপূর্ব ৫৩০-৩৩০	:	পারস্য সাম্রাজ্যের যুগ
” ৫০০	:	এথেন্সে পেরিক্লিসের যুগ ;
	:	ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের আবির্ভাব
” ৪০০	:	এথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ : এথেন্স ধ্বংস ; সক্রেটিস ও প্লেটোর আবির্ভাব ; রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সূত্রপাত
” ৩২৬	:	ম্যাসিডনের অধিপতি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
” ৩২১	:	মগধে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা
” ৩১৫-২০৬	:	চীনে চি'ন রাজবংশের শাসনকাল
” ২০০	:	রোম-কার্থেজ যুদ্ধের অবসান : কার্থেজ ধ্বংস ; গ্রীস রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
” ১৮৫	:	মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন
” ১০০	:	রোমে জুলিয়াস সীজারের উত্থান ও পতন
খৃস্টাব্দ ৭	:	পশ্চিম ইউরোপে খৃস্টধর্মপ্রচার
” ৭৮	:	ভারতে 'শক সম্বতের' প্রবর্তন
” ১০০	:	রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ; ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য
” ২০০-৩০০	:	রোমে বর্বর জাতির আক্রমণ
” ৩১৯-৩২০	:	'গুপ্ত সম্বতের' প্রবর্তন ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
” ৪০০	:	রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে বিভক্ত
” ৪০৫-৪১১	:	চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েনের ভারত ভ্রমণ
” ৫৫০	:	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

(৩) প্রশ্নমালা

প্রথম অধ্যায়

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। ইতিহাস কেন পড় ?

২। ইতিহাস না পড়লে কি অসুবিধা হ'ত ?

৩। ইতিহাস পড়াতে কি সুবিধা হবে ?

৪। প্রত্নতাত্ত্বিক কাদের বলে ?

৫। ইতিহাসের উপাদান কাকে বলে ?

৬। ইতিহাসের কোন্ উপাদান মাটির তলায় পাওয়া যায় ?

সংক্ষেপে লেখ :

১। কেমন ক'রে মানুষ বর্বর অবস্থা থেকে সভ্য অবস্থায় পৌছেছিল ?

২। কেমন ক'রে মানুষ প্রথমে গ্রাম ও পরে নগর তৈরী ক'রেছিল ?

৩। ইতিহাসের উপাদান কয়টি ও কি কি ?

৪। ইতিহাসের অলিখিত ও লিখিত উপাদানের পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখার কি ফল হয়েছিল ?

২। 'পিকিং মানুষ' কাদের বলে ?

৩। কোন্ যুগের মানুষ ছিল খাদ্যসংগ্রহকারী ?

৪। ভারতে খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষের বাস কোথায় ছিল ?

৫। 'পুরানো প্রস্তর যুগ' কাকে বলে ?

৬। 'নূতন প্রস্তর যুগ' বলতে কি বোঝায় ?

সংক্ষেপে লেখ :

১। মানুষ প্রথমে কিভাবে আগুন জ্বালাতে ও তার ব্যবহার করতে শিখেছিল ?

২। আগুন আবিষ্কারের কৃতিত্ব কাদের ? তাদের সম্বন্ধে কি জান ?

৩। আদিম মানুষ কি কি উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ ক'রত ?

৪। পুরানো প্রস্তর যুগের মানুষ জীবনধারণের জন্যে কি কি উপকরণ ব্যবহার করত ?

৫। নৃতন প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে জীবন যাপন ক'রত ?

৬। নৃতন প্রস্তর যুগে কিভাবে মানুষের সভ্যতার সূত্রপাত হ'য়েছিল ?

তৃতীয় অধ্যায়

একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১। মানুষ প্রথম কোন্ ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল ?

২। পুরানো নগর-সমাজে কয়টি শ্রেণী ছিল ?

৩। কোন্ কোন্ নদীর তীরে প্রাচীন নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

সংক্ষেপে লেখ ঃ

১। পুরানো নগর-সভ্যতায় কিভাবে শিল্প ও বাণিজ্য শুরু হ'য়েছিল ?

২। সমাজে কিভাবে এসেছিল পরিবর্তন ?

৩। রাষ্ট্রের সভ্যতার জন্মভূমি নদীতীরে হবার কারণ কি ?

চতুর্থ অধ্যায়

একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১। 'মেসোপটেমিয়া' কথার অর্থ কি ?

২। মৃৎশিল্পের যুগান্তর ঘটে কোন্ দেশে ?

৩। 'জিগ্‌গুরাট' কি ?

৪। সুমেরীয় লিখনপ্রণালীকে কি বলা হয় ?

৫। 'নীলনদের দান' বলা হয় কোন্ দেশকে ? কেন ?

৬। 'ফ্যারাও' কথার অর্থ কি ?

৭। 'প্যাপিরাস' কাকে বলে ?

৮। মিশরের প্রধান বন্দরের নাম কি বল।

৯। 'মমি' কাকে বলে ?

১০। মিশরের সমাজে ক'টি শ্রেণী ছিল ?

১১। 'মহেঞ্জোদারো' মানে কি ?

১২। সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কার কে করেন ?

১৩। সিন্ধু উপত্যকার মানুষের প্রধান খাদ্য কি ছিল ?

১৪। সিন্ধুনদের তীরে 'সীলে'র ব্যবহার হ'ত কিভাবে ?

১৫। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন কোথায় কোথায় আবিষ্কৃত হ'য়েছে ?

১৬। চীনের প্রথম পাঁচজন রাজার নাম কি ছিল ?

১৭। 'জেন হুয়াং' কাদের বলা হ'ত ?

১৮। চীনের আদর্শ সম্রাট কে ছিলেন ?

১৯। পুরোহিত শ্রেণীর বিশেষ মর্যাদা কোন্ দেশে ছিল ?

২০। রাজাকে দেবতা মনে করা হ'ত কোন্ দেশে ?

সংক্ষেপে লেখ :

১। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা শিল্প ও বাণিজ্যে কতদূর উন্নত ছিল ?

২। মিশরের ফ্যারাওদের সবচেয়ে বড় কীর্তি কি ? সে সম্বন্ধে কি জান ?

৩। সিন্ধুসভ্যতার নগর-পরিকল্পনা কেমন ছিল ?

৪। 'চীনের দুঃখ' কি ? কে কার সময়ে সেই দুঃখ দূর করেছিলেন ?

৫। প্রাচীন নগর-সভ্যতায় যে-সব সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হ'য়েছিল তাদের পরিচয় দাও।

৬। প্রাচীন নগর-সভ্যতার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের পরিচয় জান কি ?

পঞ্চম অধ্যায়

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। লোহার ব্যবহার কবে কোন্ দেশে সুরু হয় ?

২। হরফ বা অক্ষরের আবিষ্কার করে কোন্ জাতি ?

৩। মুদ্রার ব্যবহার প্রথম কোন্ দেশে সুরু হয় ?

সংক্ষেপে লেখ :

১। লৌহযুগে সমাজ জীবনে কি পরিবর্তন এসেছিল ?

২। এই যুগে রাজার শক্তিবৃদ্ধি কেন ও কিভাবে হ'য়েছিল ?

৫·১(১)। ব্যাবিলন

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। ব্যাবিলনে 'শেকেল' ও 'মীনা' বলতে কি বোঝাত ?

২। নিপ্‌পুর কি ও কেন বিখ্যাত ?

৩। 'টাওয়ার অব্ ব্যাবেল' কাকে বলা হ'ত ?

৪। 'পতেসি' নাম কাদের ছিল ?

৫। 'কিউনিফরম' লিপি কি কাজে ব্যবহৃত হ'ত ?

৬। 'গিলগামেস' কি ও কেন বিখ্যাত ?

৭। হামুরাবি কে ?

সংক্ষেপে লেখ :

১। ব্যাবিলন ব্যবসা-বাণিজ্যে কতদূর অগ্রসর ছিল ?
২। ব্যাবিলনের নাগরিক জীবনে মন্দিরের প্রভাব কতটা ছিল ?
৩। 'হামুরাবি সংহিতা' সম্বন্ধে কি জান ?

৫'১ (২)। সাম্রাজ্যবাদী মিশর

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। মিশরী দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ছিলেন ?
২। ফ্যারাওদের রাজধানী কোথায় ছিল ?
৩। মিশরে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তা কে ছিলেন ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মিশরের 'সাম্রাজ্যের যুগ' বলতে কি বোঝ? ফ্যারাওরা কিভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রেছিলেন ?
২। মিশরে পুরোহিতদের কি কি কাজ ছিল ? ফ্যারাওদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ হ'ত কেন ?

৫'১ (৩)। ইরান

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। পারসিক সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
২। কোন্ পারসিক সম্রাট ভারত জয় করেন ?
৩। 'জেন্দ-আবেস্তা' কাকে বলে ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। কিভাবে পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার হয় ?
২। জরথুস্ট্রের ধর্মমত কি ছিল ?

৫'১ (৪)। ইহুদি জাতি

একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১। ইহুদিদের পূর্বপুরুষ কে ছিলেন ?
২। 'প্রতিশ্রুত দেশ' কাকে বলা হত ?
৩। মোজেস কে ছিলেন ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। কেমন ক'রে ইহুদিরা মিশর ছেড়ে প্যালেস্টাইনে এসেছিল ?
২। 'মোজেস-বিধি' কাকে বলে ? এতে কাদের কি প্রয়োজন মিটেছিল ?

৫'২। গ্রীস

একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১। ক্রীট কোথায় অবস্থিত ছিল ?
২। হোমারের দু'খানি কাব্যের নাম কি ?
৩। গ্রীসের কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের নাম বল।
৪। 'অলিম্পিক' কাকে বলে ?
৫। 'হেল্লাস' কোন্ দেশের নাম ?
৬। লাইকার্গাস কে ছিলেন ?
৭। পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধ কাদের মধ্যে হ'য়েছিল ?
৮। 'গ্রীসের শিক্ষয়িত্রী' কাকে বলা হ'ত ?
৯। পেরিক্লিস কে ছিলেন ?
১০। সফোক্লিসের পরিচয় কি ?
১১। পারথেননে এথেনার মূর্তি কে তৈরি করেন ?
১২। গ্রীসের প্রথম ঐতিহাসিক কে ?
১৩। দার্শনিক প্লেটোর শিক্ষক কে ছিলেন ?
১৪। আরিস্টট্‌ল কার শিক্ষক ছিলেন ?
১৫। আলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরের দেশগুলি জয় করেননি কেন ?

সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ

১। হোমারের যুগ কাকে বলা হয় ? সে-যুগে গ্রীসের অবস্থা কেমন ছিল ?
২। গ্রীক জাতির একতাবোধ কিভাবে গড়ে ওঠে ?
৩। এথেন্সের শিক্ষার আদর্শ কি ছিল ? স্পার্টার শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় ?
৪। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সে কোন্ কোন্ দিকে উন্নতি হ'য়েছিল ?
৫। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন সফল হ'য়েছিল কতদূর ?

৫.৩। রোম

একটি বাক্যে উত্তর দাও:

১। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
২। রোম কোথায় অবস্থিত ছিল?
৩। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত ছিল?
৪। পিউনিক যুদ্ধ কাদের মধ্যে হ'য়েছিল?
৫। প্রাচীন রোম-সমাজের দুটি শ্রেণীর নাম কি?
৬। হানিবল কে ছিলেন?
৭। ক্রীতদাস-বিদ্রোহের নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন?
৮। সীজারের দুই বন্ধু কে কে ছিলেন?
৯। সীজারের হত্যাকারী কে ছিলেন?
১০। রোমের প্রথম সম্রাট কে?
১১। কার সময় খৃস্টধর্ম আইনতঃ স্বীকৃত হয়?
১২। কোন্ কোন্ বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়?

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১। রোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান?
২। পিউনিক যুদ্ধের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধ কতদিন চলেছিল এবং ফলাফল কি হ'য়েছিল?
৩। প্লেবিয়ানদের কি কি অভাব-অভিযোগ ছিল। অভিযোগগুলি দূর করা গিয়েছিল কি?
৪। কিভাবে রোমে ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন হয়? ক্রীতদাস-বিদ্রোহের কারণ কি?
৫। জুলিয়াস সীজার কিভাবে রোমের একনায়ক হয়েছিলেন?
৬। অগাস্টাসকে রোমের প্রথম সম্রাট বলা হয় কেন? তাঁর রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য কেন?
৭। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কয়েকটি কারণ বল।
৮। রোম সম্রাটদের মধ্যে কারা খৃস্টধর্মের প্রচারে বাধা এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন?

৫.৪। চীন

একটি বাক্যে উত্তর দাও:

১। শ্যাং বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
২। শ্যাং বংশের রাজধানী কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে?
৩। কংফুশির বাড়ী চীনের কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে?
৪। 'জেন' কথার অর্থ কি?

৫। 'চীনের মহাপ্রাচীর' কেন নির্মাণ করা হয়েছিল ?

৬। 'চীনের নেপোলিয়ন' কাকে বলা হয় ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। কংফুশির জীবনী বল।

২। কংফুশি কি শিক্ষক ছিলেন ? তাঁর শিক্ষার পরিচয় দাও।

৩। সি হুয়াংতি কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ?

৫·৫। প্রাচীন ভারত

একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১। 'সপ্তনদীর দেশ' কাকে বলা হ'ত ?

২। বেদের চারটি ভাগ কি কি ?

৩। আর্য সমাজ ক'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ?

৪। জীবনের চারটি 'আশ্রমে'র নাম কি ছিল ?

৫। আর্যরা কোন্ দেবতার পূজা করতেন ?

৬। 'বিশ্‌পতি' কাকে বলা হ'ত ?

৭। মহাকাব্য দু'টির নাম কি ?

৮। জৈনধর্মের প্রবর্তন কে করেন ?

৯। বুদ্ধ কোথায় ধর্মপ্রচার শুরু করেন ?

১০। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ?

১১। 'ধর্মবিজয়' কাকে বলে ?

১২। কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ কি ?

১৩। 'গুপ্ত সম্বৎ' কবে কে প্রবর্তন করেন ?

১৪। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' কে রচনা করেন ?

১৫। 'শকারি' কাকে বলা হয় ?

১৬। কোন্ গুপ্ত রাজা হূণদের পরাজিত করেন ?

১৭। 'গঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ কোথায় আছে ?

১৮। রাজা চন্দ্রবর্মা কোথায় রাজত্ব করতেন ?

১৯। ফরিদপুর তাম্রশাসনগুলিতে কোন্ কোন্ রাজার নাম পাওয়া যায় ?

২০। মধ্য এশিয়ায় কে ভারতীয় সভ্যতার চিহ্নগুলি আবিষ্কার করেন ?

২১। 'ইণ্ডিকা' কার লেখা?

২২। গুপ্ত শাসনকালে কোন্ চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন?

২৩। সাঁচী স্তূপ কোন্ সময় তৈরী হয়?

২৪। "বুদ্ধচরিত" মহাকাব্য কার রচনা?

২৫। কোন্ চৈনিক পরিব্রাজক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

২৬। আর্যভট কে ছিলেন?

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল? কিভাবে তারা এসে ভারতে বসতি বিস্তার করে?

২। বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় দাও।

৩। বৈদিক যুগে আর্যদের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৪। মহাবীরের জীবনী বল। তাঁর ধর্মমতের পরিচয় দাও।

৫। গৌতম বুদ্ধের জীবন-আলেখ্য দাও। তাঁর ধর্মমতের পরিচয় দাও।

৬। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? অশোকের সময় সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল?

৭। কুষাণ সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন? কণিষ্ককে কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন?

৮। গুপ্তদের মূল রাজ্য কতখানি ছিল? সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তা' কতদূর বিস্তৃত হয়?

৯। রাঢ় ও বঙ্গ প্রাচীন দেশ—এ কথা কিভাবে জানা যায়?

১০। মৌর্য থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কথা কতটুকু জানা যায়?

১১। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের কথা কিভাবে জানা যায়?

১২। মৌর্য যুগে ভারতের অবস্থা মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে কতখানি জানা যায়?

১৩। ফা-হিয়েনের বিবরণে ভারতের কোন অংশের কথা বিশেষভাবে জানা যায়? কি জানা যায়?

১৪। প্রাচীন ভারতে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল কি? তার পরিচয় দাও।

১৫। সাহিত্য ও বিজ্ঞান—কোনও দিকেই প্রাচীন ভারত যে পিছিয়ে ছিল না, তা' দেখিয়ে দাও।

বিষয়মুখী (Objective) প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

নির্দিষ্ট স্থানে চিহ্ন (√) দিয়ে সঠিক উত্তর দেখিয়ে দাও :

১। অসভ্য মানুষ বাস করত কোথায়? গুহায়/জঙ্গলে/গ্রামে/নগরে।

২। ইতিহাস পড়লে আমরা কি বুঝতে পারি? মানুষের সভ্যতা পিছিয়ে যাচ্ছে/এগিয়ে চলেছে/এগোয়নি বা পেছোয়নি।

৩। পুরানো জিনিস নিয়ে কারা গবেষণা করেন? ঐতিহাসিক/বৈজ্ঞানিক/ভৌগোলিক/প্রত্নতাত্ত্বিক।

৪। প্রাচীন মানুষের ইতিহাস জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? প্রাচীন গল্প পড়া/বিদেশী পর্যটকের বিবরণ পড়া/প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। আগুনের ব্যবহার শেখার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সভ্যতার সূত্রপাত হল —— যুগে।

২। চীনের পিকিং শহরের কাছে —— নামক স্থানের গুহাগুলিতে মানুষের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

৩। —— যুগে মানুষের জীবিকানির্বাহের উপায় ছিল শিকার।

৪। —— ভারতকেই বলা হয় আদিম খাদ্যসংগ্রহকারী মানব সভ্যতার জন্মস্থান।

৫। পুরানো প্রস্তর যুগের মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ——।

৬। চাষ-বাসের আবিষ্কার করে ——, —— নয়।

৭। মানুষের প্রথম লিখন ছিল ——।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্দিষ্ট স্থানে (√) দিয়ে সঠিক উত্তর দেখিয়ে দাও :

১। উত্তর ভারতে প্রস্তর যুগের পর কোন্ যুগ? লৌহযুগ/তাম্রযুগ/ব্রোঞ্জযুগ।

২। সিন্ধু উপত্যকায় কোন্ যুগে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? ব্রোঞ্জযুগ/তাম্রযুগ/লৌহযুগ।

৩। নগরবাসীরা তাদের খাদ্যের জন্যে নির্ভরশীল কার ওপর? অন্য নগর/গ্রাম/রাষ্ট্র।

৪। সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কারা? কৃষক/শ্রমিক/পুরোহিত/বণিক/যোদ্ধা।

৫। শাসকশ্রেণীতে পড়ত কারা? পুরোহিত/যোদ্ধা/বণিক/কৃষক/শ্রমিক।

৬। নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোন্ কোন্ নদীর তীরে? আমাজন/ভল্গা/গঙ্গা/নীলনদ/সিন্ধু/টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস।

চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী দেশের নাম ——।

২। পৃথিবীতে প্রথম নগরসভ্যতা সৃষ্টির কৃতিত্ব ——।

৩। প্রাচীন যুগে সুমেরে প্রচলিত লিখনপ্রণালীর নাম ছিল ——।

৪। মিশর —— দান।

৫। ফ্যারাও কথার অর্থ ——।

৬। মিশরের ছেলেরা বড় হয়ে —— ওপর দলিলপত্র লিখত।

৭। মিশরী বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করেন —— নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত।

৮। মিশরের প্রধান বন্দর ছিল ——।

৯। ফ্যারাওদের কবর হ'ল ——।

১০। ———— প্রভৃতি নগরীতে অনেক মন্দির ছিল।

১১। সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায় —— এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলায় —— নামক গ্রামের মাটির তলায় প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গিয়েছে।

১২। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের —— যাপন ক'রত।

১৩। মহেঞ্জোদারোতে কোনও —— পাওয়া যায়নি।

১৪। —— এবং —— অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে চীনের প্রস্তরযুগের সভ্যতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

১৫। রাজা — এর সময়ে হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধ করার ব্যবস্থা হয়।

১৬। মিশরে —— ও —— সভ্যতার বিশেষ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

নির্দিষ্ট স্থানে চিহ্ন (√) দিয়ে সঠিক উত্তর দেখিয়ে দাও ঃ

১। কোথায় প্রথম মানুষের তৈরী লোহার সন্ধান পাওয়া যায়? ভারত/আরব/সিরিয়া।

২। কোন্ জাতি প্রথম অক্ষর দিয়ে লেখার পদ্ধতি বার করেছিল? মিশরীয়/সুমেরীয়/ফিনিসীয়।

৩। ব্যাবিলনে মন্দিরের উঁচু চূড়াকে কি বলা হ'ত? শিখর/জিগ্‌গুরাট/টাওয়ার।

৪। কিসের গতি দেখে সময়ের পরিমাপ করা হ'ত ব্যাবিলনে? সূর্যের/পৃথিবীর/চন্দ্রের।

৫। ব্যাবিলনে আইনবিধি রচনা করেছিলেন কে? সোলেমান/ডেভিড/হামুরাবি।

৬। মিশরের 'নেপোলিয়ন' কোন্ ফ্যারাওকে বলা হয়। খুফু/পেপি/তৃতীয় থাটমোজ।

৭। প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের সংস্কার কে করেন? কনফুসিয়াস/সক্রেটিস/জরথুস্ট্র।

৮। ফ্যারাওর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইহুদীরা কার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করেছিলেন। আব্রাহাম/মোজেস।

৯। কার আমলকে গ্রীসের ইতিহাসে 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়? লাইকারগাস/জেম্বিপ্পাস/পেরিক্লাস।

১০। এথেন্সের চিন্তাজগতে আলোড়ন কে এনেছিলেন? সফোক্লিস/হেরোডোটাস/সক্রেটিস।

১১। কে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করে? নীরো/সিজার/রমুলাস।

১২। রোমের সুবিধাভোগী শ্রেণীর নাম কি ছিল? পুরোহিত/বণিক/প্যাট্রিশিয়ান।

১৩। ক্রীতদাসদের বিদ্রোহে কে বা কারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? প্লেবিয়ানরা/স্পার্টাকাস নামে এক গ্লাডিয়েটর।

১৪। রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে করেন? পম্পে/সীজার/অগাস্টাস।

১৫। চীনের শিক্ষাগুরু কে ছিলেন। চেং ট্যাং/ওয়াং চেং/কন্‌ফুসিয়াস।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। প্রত্যেকটি বেদ চার ভাগে বিভক্ত — — — —।

২। ক্ষত্রিয়দের কাজ — ও —।

৩। আর্যদের উপাসনার জন্যে কোন — বা — ছিল না।

৪। বিশ্‌ বা জনের প্রধানকে বলা হ'ত —।

৫। খৃস্টপূর্ব — — থেকে খৃস্টীয় — — রামায়ণ ও মহাভারত রচনার কাল।

৬। 'জিন'-এর শিষ্যরা — নামে পরিচিত হন।

৭। বুদ্ধদেবের মতে নির্বাণ লাভের উপায় — — — — — — —।

৮। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —।

৯। অশোকের অনুশাসনগুলি — নামে পরিচিত।

১০। — ছিলেন কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা।

১১। হরিষেণ রচিত — থেকে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক কীর্তির কথা জানা যায়।

১২। সেকালে পশ্চিমবঙ্গ — ও — বিভক্ত ছিল।

১৩। — নামে বাংলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

১৪। সেলিউকাসের রাজসভা থেকে গ্রীক দূত — ভারতবর্ষে আসেন।

১৫। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে চীনা পরিব্রাজক — ভারতে আসেন।

১৬। মহারাষ্ট্রে — ও — গুহাসকল ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন।

১৭। অশ্বঘোষ — নামে মহাকাব্য রচনা করেন।

১৮। — ছিল প্রাচীন যুগে একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র।

১৯। — প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।





ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ